তিন গোয়েন্দা

জলদস্যুর দ্বীপ ২

রকিব হাসান

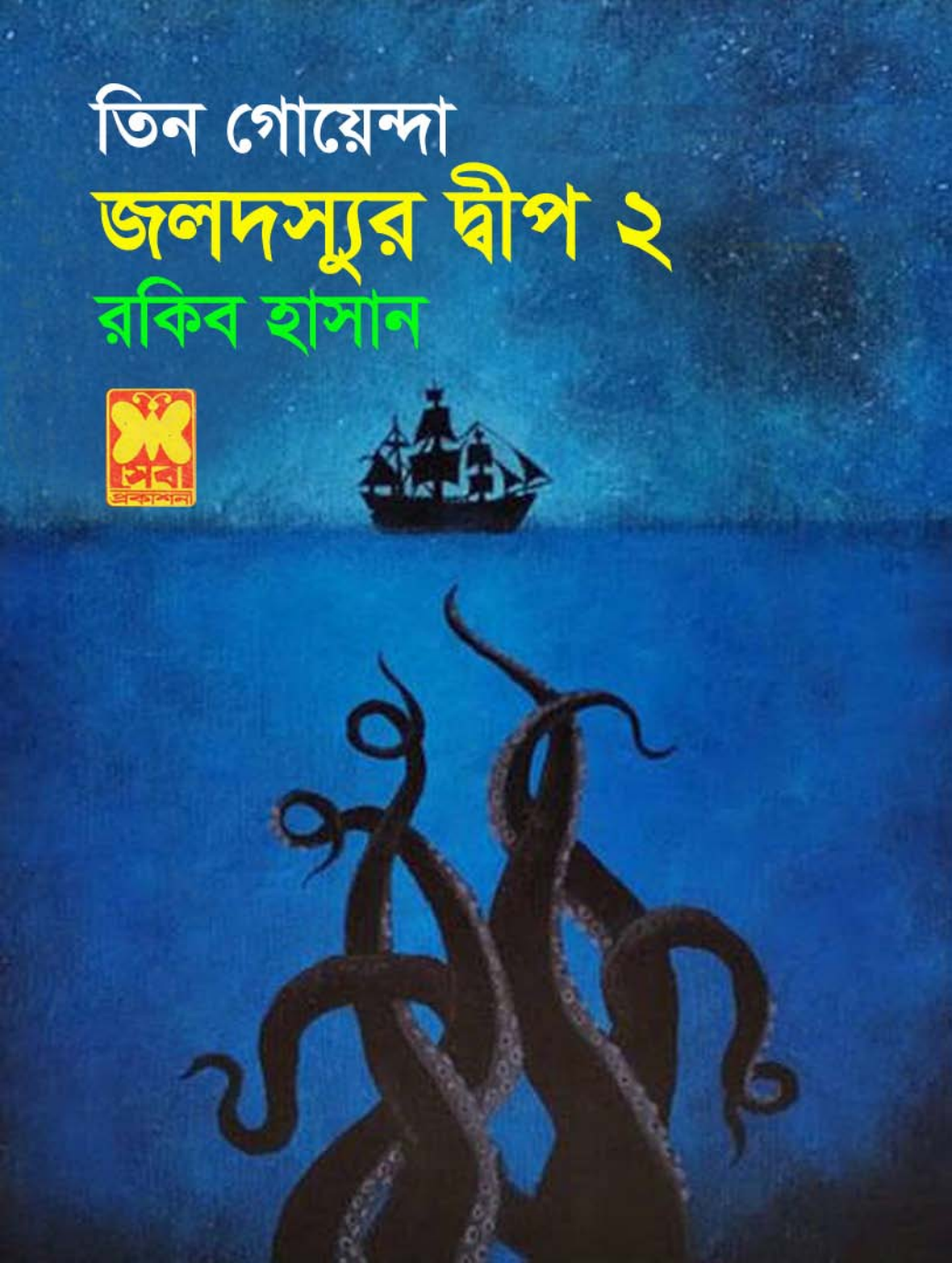

ISBN 984-16-1282-8

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-2
Part-2
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hasan

ছত্রিশ টাকা

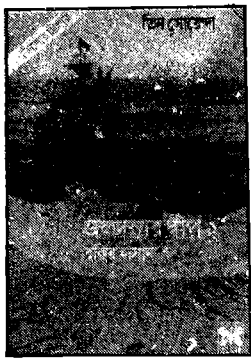

জলদস্যুর দ্বীপ ২

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৭

ছোট্ট একটা ল্যাগুন, প্রবেশমুখের কাছে আড়াআড়িভাবে বাঁধের মত গড়ে উঠেছে প্রবাল-প্রাচীর, ঢেউ আটকাচ্ছে। ল্যাগুনে ভাসছে ছোট একটা বিমান। এক নজর দেখেই বুঝল কিশোর ও মুসা, ওটা ওদের উড়চর, ম্যারাবিনা থেকে যেটা ছিনতাই হয়েছে। মস্ত এক জলচর পাখির মত ভাসছে ওটা পানিতে, দোল খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউয়ে। ওটা থেকে তিরিশ কি চল্লিশ গজ দূরে তীরে পড়ে রয়েছে রবারের ডিঙিটা।

দ্রুত একবার ল্যাগুনের পাড়ের জঙ্গলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর, লোকগুলোকে দেখা যায় কিনা দেখছে। নেই। আশ্চর্য! গেল কোথায়? মুসার দিকে ফিরে বলল, 'কি বুঝলে?'

'বিগ হ্যামার আর তার দল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা বলছি না...'

'তাহলে?'

'বুঝলে না?' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'এটাই সেই দ্বীপ!'

ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, চেয়ে রইল। কথাটা একবারও মনে হয়নি তার। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তো, এখন কি করব আমরা?'

'কি করব...,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'ওমরভাই থাকলে প্লেনটা আবার দখল করা যেত।'

'নেই যখন, তা আর করতে পারছি না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।'

সাগরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ঢেউয়ের মাথায় এখনও শাদা শাদা ফুটকি। মাথা নাড়ল সে আনমনে। 'আর কি ভাবব?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল। 'প্লেনটা এখনও দখল করা যায় হয়তো, কিন্তু কি করে বের করে নিয়ে যাব ল্যাগুন থেকে? আমি অন্তত পারব না। জায়গা নেই, ওড়ার গতি সঞ্চয় করার আগেই বাঁধের কাছে পৌঁছে যাবে প্লেন। সৈকতও ওটা খুব ছোট, ডাঙা থেকে যে উড়ব তারও উপায় নেই।'

'কি বলতে চাও আসলে?'

'বলতে চাই,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'প্লেনটা স্টার্ট দিতে পারব, ওমরভাইয়ের সঙ্গে থেকে সেটুকু শিখেছি, আগে বাড়াতেও পারব, কিন্তু অত্তোটুকুন জায়গায় ওটা নিয়ে উড়াল দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে, ওমরভাইও পারবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, উড়তে যদিও বা পারি, নামতে পারব না, নামাতে জানি না।

অ্যাকসিডেন্ট করে মরব।'

'হুঁ! কিন্তু এখন করবটা কি?'

'অন্ধকারও হয়ে আসছে। এখন আর কিছুই করার নেই, লুকিয়ে থেকে সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া।'

'কি সুযোগ?'

'জানি না। তবে কোন না কোন সুযোগ পেয়েও যেতে পারি। চলো, কাটি এখান থেকে। ওরা যে-কোন সময় এসে পড়তে পারে। নিশ্চয় ব্যাটারা গুপ্তধন-শিকারে বেরিয়েছে।'

উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে চলল দু'জনে, উদ্দেশ্য, বনে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু ভাগ্য ওদের নেহায়েত খারাপ। খানিক দূর এগোতে না এগোতেই পড়ল আরেক বিপদে।

ঘন একটা নারকেল কুঞ্জ থেকে বেরিয়েই লোকটার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। ফেকাসে চেহারার হালকা-পাতলা এক লোক, উল্টোদিক থেকে আসছিল। লোকটাকে চেনে না দুই গোয়েন্দা, কিন্তু তার হাবভাব, চেহারা, আর হাতের রাইফেল দেখে অনুমান করতে কষ্ট হলো না, সে কে।

'আরে, আরে,' টেনে টেনে কথা বলে লোকটা, 'কি অবাক কাণ্ড! তোমরা! এসো এসো, হ্যামার দেখলে খুব খুশি হবে। বলছিল, তোমরা এসেও পড়তে পারো।'

শান্ত চোখে লোকটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ভয় পাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে জমে উঠছে ঠাণ্ডা রাগ। 'তুমি ইমেট চাব?'

'বা-বাহ, নামও তো জানো দেখছি। এসো, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আলো থাকতে থাকতেই যাওয়া দরকার, নইলে পাথরে পিছলে পড়ে ঠ্যাং ভাঙবে।'

অসহায় বোধ করল দুই গোয়েন্দা, কিছু করার নেই, নীরবে চলল লোকটার সঙ্গে। ল্যাগুনের এক ধারে ছোট্ট একটা খোলা জায়গায় নিয়ে এল তাদেরকে চাব, পাথরের স্তূপ আড়াল করে রেখেছে, তাই জায়গাটা আগে দেখতে পায়নি মুসা কিংবা কিশোর। তিনজন বসে আছে ওখানে। হ্যামারের পাশে বসেছে লম্বা এক লোক, কোটরে বসা চোখ ঘোলাটে। তাদের উল্টোদিকে বসেছে কুচকুচে কালো বিশাল এক নিগ্রো, বেশভূষা দেখে অন্য সময় হলে হেসে ফেলত মুসা, কিন্তু এখন হাসি আসছে না। চানাচুর কিংবা সাবানের বিজ্ঞাপন করার জন্যে যেন সং সেজেছে লোকটা, মাথায় চূড়াওয়ালা টুপিটা শুধু নেই।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিগ্রো, কড়া চোখে তাকিয়ে রয়েছে বন্দিদের দিকে। এমনিতে ঝুলে থাকা ঠোঁট আরও ঝুলে পড়েছে। হাতের মোটা মোটা আঙুল মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে ধীরে ধীরে। বিস্মিত।

'তো, এসে গেছ,' কিশোরের দিকে চেয়ে বলল হ্যামার।

'তাই তো মনে হয়, নাকি?' বাঁকা জবাব দিল কিশোর।

'যা জিজ্ঞেস করব, সোজা জবাব দেবে, নইলে...,' কি করবে মুঠো পাকিয়ে

দেখাল হ্যামার। ধমকে উঠল, 'আরগুলো কোথায়?'

'কোথায়, আমারও জানতে ইচ্ছে করছে,' বলল কিশোর।

'জানো না বলতে চাও? মিথ্যে বললে বিপদে পড়বে। কোথায় ওরা?'

মিথ্যে বলার দরকার নেই। তাছাড়া, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে কিশোর। যা খুশি ঘটে ঘটুক, পরোয়া করে না আর। 'মিছে কথা বলব কেন? বোধহয় ডুবে মরেছে ওরা,' খসখসে কণ্ঠে বলল সে। 'ঝড়ের আঘাতে ভেঙে পড়েছে প্লেন, সাগরে পড়ে চুরমার হয়েছে। আমরা দু'জন বেঁচে গেছি। ব্যস, যা জানি বললাম।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। কিশোরের বলার ধরনে এমন কিছু রয়েছে, তার কথা অবিশ্বাস করতে পারল না শত্রুরা।

'বেশি চালাকির ফল,' অবশেষে বলল হ্যামার। সঙ্গীদের দিকে ফিরল, 'ছেলেদুটোকে কি করব?'

দাঁত বের করে হাসল নিগ্রো ম্যাবরি ভেনাবল। চোখের পলকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ক্ষুর। ভয়ংকর ভঙ্গিতে হাতের তালুতে ঘষতে শুরু করল ঝকঝকে ক্ষুরের ফলা।

'সরাও ওটা,' ধমক দিল ঘোলাটে চোখো। 'অহেতুক খুন-জখমের কোন মানে নেই। ওদেরকে ছেড়ে দিলেই কি? ক্ষতি তো আর করতে পারছে না।'

'যদি প্লেনটা নিয়ে পালায়?' বলল ইমেট চাব। 'ছেলেগুলো খুব বেশি চালাক। প্লেন চালাতে জানে কিনা কে জানে। এখুনি ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলল হ্যামার। 'তাছাড়া আমরা যা খুঁজছি, ওগুলোর ব্যাপারেও হয়তো জানে।'

'নিশ্চই,' জোরে মাথা ঝাঁকাল চাব। 'বেঁধে ফেলে রাখি। সকালে শুনব আমরা কি কি জানে। সারা রাত বাঁধা থাকলে সকালে মন বদলাবে। গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করবে হয়তো। তাড়াহুড়ো করে এখনি কিছু করে ফেলার কি দরকার?'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল হ্যামার। 'বাঁধো, বেঁধে ফেলো। ইচ্ছে করলে যখন খুশি মেরে ফেলে দিতে পারি; কিংবা ছেড়ে দিতে পারি। সেটা পরে ভাবব। ম্যাবরি, দড়ি আনো।'

এক ধারে পড়ে থাকা মালপত্র ঘেঁটে দড়ি বের করল ম্যাবরি। খপ করে মুসার কব্জি চেপে ধরল। চাপের চোটে মুঠো আপনা আপনি আলগা হয়ে গেল গোয়েন্দা-সহকারীর, মোহরটা হাতেই ছিল, আঙুল খুলে যেতেই বালিতে পড়ল।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাবরি, ছোঁ মেরে তুলে নিল মোহরটা। 'কোথায় পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল মুসাকে, দেখাচ্ছে সঙ্গীদেরকে।

জবাব দিল না মুসা।

'কোথায় পেয়েছ?' গর্জে উঠল হ্যামার। 'বলছ না কেন?'

'এটা সেই ডাবলুনটাই,' ঠাণ্ডা গলায় বলল মুসা, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে যেটা পেয়েছি।'

'মিছে কথা। ওটা অ্যালেন কিনির কাছে,' বলল ম্যাবরি। 'বস্, ওরা জানে মোহরের সন্ধান।'

'বললাম না, এটা সেই মোহরটাই,' জোর গলায় প্রতিবাদ করল মুসা। 'অ্যালেন কিনির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। আমাদের দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? প্লেন ভেঙে মরার দশা, আর এনারা বলছেন মোহর খুঁজে পেয়েছি। আমাদের চেহারা দেখে সেরকম লাগছে?'

'দেখি তো মোহরটা,' ম্যাবরির দিকে হাত বাড়াল হ্যামার।

দ্বিধা করছে ম্যাবরি।

কিশোরের মনে হলো, ঠিক ওভাবেই দ্বিধা করেছিল ববের বাবা, হয়তো ঠিক ওই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে। হয়তো ওভাবেই হাত বাড়িয়েছিল হ্যামার সেদিনও। দিতে অস্বীকার করেছিল মিস্টার কলিন্স।

'আমি এটা রাখি, বস্,' অনুনয় করল ম্যাবরি।

কি ভাবল হ্যামার। 'ঠিক আছে, রাখো। একটা নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই, অনেক পাব শিগগিরই।'

খুশিতে বাগবাগ হয়ে মোহরটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ম্যাবরি। তারপর দড়ি নিয়ে কাজে লেগে গেল। মুসার দুই কব্জি এক করে বাঁধল, ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুই পা বাঁধল। নরম বালি না হলে খুব ব্যথা পেত মুসা। ঠিক একই ভাবে কিশোরকেও বাঁধা হলো।

রাত নামল। চাঁদ উঠল। রূপালী আলোর বন্যায় প্লাবিত করে দিল চারপাশে, ছোট্ট ল্যাগুনের পানিকে মনে হচ্ছে এখন তরল রূপা।

বালিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ইমেট চাব। অন্য তিনজনও তাই করল।

কিশোর আর মুসাকে শাসাল হ্যামার। 'সকালে তোমাদের ব্যবস্থা করব দাঁড়াও!' বলে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে।

দুই

পানি থেকে জ্যাকেটটা যখন তুলেছে মুসা, তখন সে কিংবা কিশোর তাদের বাঁয়ে ভালমত তাকালেই দেখতে পেত ববকে। ঝড়ের তোড়ে সাগরের তল থেকে ছিঁড়ে উঠে আসা শেওলা স্তূপ হয়ে আছে একটা জায়গায়। ভেজা, পিচ্ছিল শেওলার স্তূপের তলায় প্রায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে ববের শরীর। না, মরেনি বব, খুব সৌভাগ্য, বিশাল একটা ঢেউ ছুঁড়ে ফেলেছে তাকে সৈকতে। বেহুঁশ হয়ে আছে।

মুসা আর কিশোর চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না বব। লাশ হয়ে পড়ে আছে যেন। সূর্য ডুবল। ভাটা শুরু হলো সাগরে! চাঁদ উঠল, ববের ফেকাসে চেহারা আরও ফেকাসে দেখাচ্ছে এখন রূপালী জ্যোৎস্নায়। গর্ত থেকে বেরিয়ে মার্চ করে এগিয়ে এল একটা কাঁকড়া, দাঁড়া দুটো শূন্যে তুলে রেখেছে অদ্ভুত দুটো অ্যান্টেনার মত, চলার তালে তালে দুলছে। দাঁড়ার মাথার ধারাল আঁকশি জোড়া মৃদু কিটকিট শব্দ করে একবার খুলছে, একবার বন্ধ করছে।

দুই গজ মত এগিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল কাঁকড়াটা, কোনরকম বিপদ আছে কিনা আন্দাজ করতে চাইছে হয়তো। আরেক গর্ত থেকে আরেকটা কাঁকড়া এসে যোগ দিল প্রথমটার সাথে। আরেকটা, তারপর আরও একটা, দেখতে দেখতে যেন

কাঁকড়ার হাট জমে গেল ওখানে। একটা অর্ধচন্দ্র সৃষ্টি করে এক সঙ্গে মার্চ করে এগোল দলটা অবশ হয়ে পড়ে থাকা দেহটার দিকে। নীরব রাত ভরে গেল জীবগুলোর দাঁড়ার অদ্ভুত কিটকিট শব্দে। যতই এগোচ্ছে, ধীরে ধীরে গতি কমাচ্ছে কাঁকড়াগুলো, আশ্চর্য শৃঙ্খলা। সব ক'টার গতি একই রকম থাকছে, এতটুকু এদিক ওদিক নেই।

নড়েচড়ে উঠল ববের শরীর। চোখের পলকে থেমে গেল কাঁকড়া-বাহিনী, একই সঙ্গে, তারপর দ্রুত একটা ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল তিন দিকে। দেখতে দেখতে গায়েব হয়ে গেল।

চোখ মেলল বব। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল তারাখচিত আকাশের দিকে, হঠাৎ করেই ফিরে এল বোধশক্তি, ডান কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল তাড়াতাড়ি। তাকাল জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল সাগরের দিকে। পুরো এক মিনিট লাগল নিজেকে বোঝাতে, যে সে স্বপ্ন দেখছে না, সমস্ত ব্যাপারটাই কঠোর বাস্তব। উঠে দাঁড়াল সে। পাক দিয়ে উঠল মাথার ভেতর, গল গল করে বমি করে ফেলল। পেট থেকে নোনা পানি বেরিয়ে যাওয়ায় বরং ভালই হলো, হালকা হয়ে গেল শরীর আর মাথার ভেতরটা, টলোমলো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে এখন। শরীরের জায়গায় জায়গায় ব্যথা অনুভব করছে, আঙুল কাঁপছে।

আরেকবার বমি করল সে, পেট থেকে নোনা পানি সব বেরিয়ে যাওয়ার পর সুস্থির হলো। তাকাল চারপাশে। সঙ্গীদেরকে দেখার আশা করছে না, দেখা গেলও না, কাউকে। বিমানটাও নেই। একা সে, ভয়ংকর একাকীত্ববোধ প্রচণ্ড পীড়া দিতে শুরু করল তাকে। অন্য তিনজন পানিতে ডুবে মরেছে, এটা বিশ্বাস করতে পারছে না, বেঁচে আছে ওরা, নিরাপদে আছে, তা-ও বিশ্বাস হচ্ছে না। পানির ধার ঘেঁষে পড়ে থাকা শাদাটে একটা জিনিস চোখে পড়ল তার, কম্পিত পায়ে এগোল সেদিকে। খানিক এগিয়েই বুঝতে পারল কি ওটা, কাছে যাওয়ার দরকার হলো না—বিমানের সিঁড়ি, ওরা যেটাতে করে এসেছিল, সেটার। জোর করে চেপে রাখা পানি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, দরদর করে বেরিয়ে এল চোখ থেকে। আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। ধপ করে বালিতে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল বব।

কতক্ষণ একই ভাবে বসে থাকল বলতে পারবে না, অবশেষে উঠে দাঁড়াল আবার, এভাবে ভেঙে পড়ার কোন মানে নেই। পেছনের ঘন জঙ্গলের দিকে চেয়ে আত্মা কেঁপে গেল, কি ধরনের জানোয়ারের বাসা ওই জঙ্গলে? কি আতংক আর বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কালো গাছগুলোর আড়ালে? জানে না সে, এখান থেকে দেখে কিছু বোঝারও উপায় নেই।

দূর, যত্তোসব আজেবাজে ভাবনা!—ধমক দিয়ে মন থেকে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করল সে। আবার ফিরল সাগরের দিকে। আরে, ওই তো, ওই সেই পাথরটা। যেটাতে নামার চেষ্টা করেছিল সে। বানের পানি চলে যাওয়ায় অনেক উঁচু হয়ে আছে, নিশ্চয় শুকনো। ঢেউয়ের দাপাদাপি আর নেই এখন ওটাকে ঘিরে। তার বন্ধুরা কি ওখানেই আছে, টিলার ওপরে বা নিচে কোথাও পড়ে আছে তাদের লাশ? ববের বাবা বলত, খুন করে লাশ গুম করে না সাগর, ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

যাবে নাকি? গিয়ে দেখবে? ডানে-বাঁয়ে ভালমত তাকাল আবার, কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এগোল, এখান দিয়েই যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন কিশোর আর মুসা, পানি থাকায় পারেনি, কিন্তু এখন শুকনো, ববের যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। পাথরের টিলার কাছে চলে এল, গোড়ায় নেই কেউ, ওপরে চড়ল, না, এখানেও নেই। ফিরে এল আবার সৈকতে, পানি থেকে দূরে একেবারে জঙ্গলের ধারে উঠে এল। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে কালো বনের দিকে। বসল। এরপর কি করবে, ভাবছে। পানি দরকার আগে, গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু পানি খুঁজতে যাওয়ার সাহস নেই, চাঁদের আলোয় অদ্ভুত আলোআঁধারির খেলা জায়গায় জায়গায়, নির্জন নীরব এই পরিবেশে সেদিকে তাকাতেই গা ছমছম করছে ববের। ভোরের জন্যে অপেক্ষা করবে ঠিক করল সে। ডান হাতের তালুতে চিবুক রেখে ভাবতে লাগল নানা কথা, শূন্য দৃষ্টি স্থির একটা পাথরের স্তূপের দিকে।

বসে আছে তো আছেই। এত দীর্ঘ রাত আর আসেনি তার জীবনে। ভাগ্য ভাল, বাতাস উষ্ণ, নইলে খালি গায়ে যেভাবে বসে আছে খোলা বাতাসে, এভাবে থাকতে পারত না কিছুতেই, খুব অসুবিধেয় পড়ে যেত। নিজের কক্ষ পথে নীরবে এগিয়ে চলেছে চাঁদ, ববের ডানে সৈকত ঘুরে চলেছে যেন, অবশেষে তার বাঁয়ের পাথরগুলোর ছায়া দূর হলো চাঁদের আলো পড়ে, নীলচে উজ্জ্বল একটা আভা ছড়াচ্ছে এখন।

এই দূরবস্থায় থেকেও ঢুলুঢুলু হয়ে এল তার চোখ এক সময়, ঠিক তখনই একটা পাথরকে নড়তে দেখল সে, নাকি কল্পনা? নাহ্, কল্পনাই। যে অবস্থায় রয়েছে সে, তাতে চোখ উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই দেখতে পারে, মানে, দেখেছে মনে হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই পুরো সজাগ হয়ে গেল সে, প্রতিটি স্নায়ু টানটান। পাথরটা সত্যিই নড়ছে, ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে একটা মানুষে, চোখ বড় বড় করে ওটার দিকে চেয়ে থেকে ভাবছে বব, সে স্বপ্ন দেখছে। হয় স্বপ্ন দেখছে, নাহয় ওই জিনিস, যাকে সব চেয়ে বেশি ভয় তার। ভূত! ভূত মনে করার কারণও আছে। যে মানুষটাকে দেখছে সে, সে আধুনিক মানুষের পোশাক পরা নয়। মাথায় ছিটকাপড়ের রুমাল জড়ানো, একটা কোণা ঝুলছে ঘাড়ের ওপরে। ফতোয়ার মত একটা জামা পরনে, বুকের কাছটায় সুতার পাকানো সরু দড়ি আড়াআড়ি বুনট, ঢোলা রঙিন পাজামার নিচের দিক ঢোকানো বুটের ভেতরে—রূপার বাকলেস লাগানো রয়েছে জুতোতে, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। আরও একটা জিনিস চকচক করছে, সেটা তার হাতের মস্ত ভোজালি, চোখা মাথাটা ঠেকিয়ে রেখেছে একটা পাথরে।

হাঁ হয়ে গেছে বব, নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে। আস্তে ঘুরল মূর্তিটা, তাকিয়ে রইল প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে যেখানে ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সেদিকে। তারপর যেমন নীরবে এসেছিল, তেমনি ভাবেই গায়েব হয়ে গেল আবার।

আর কোন সন্দেহ নেই ববের, ভূতই দেখেছে, শত শত বছর আগে অপঘাতে মরা কোন জলদস্যুর ভূত। সারাজীবন যা করেছে, মৃত্যুর পরেও সেই পেশাই বোধহয় বেছে নিয়েছে ভয়ংকর ওই জলদস্যু! কিন্তু আরেকবার ওটাকে দেখার অপেক্ষা করল না বব, লাফিয়ে উঠে ছুটল বালিয়াড়ি ধরে। আরেকটা বড় পাথরের

স্তূপ চোখে পড়ার আগে গতি কমাল না। কাঁধের ওপর দিকে ফিরে তাকাল। ভূতটা তাড়া করে আসছে না দেখে থামল, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। বসে পড়ে জিরিয়ে নিল খানিকক্ষণ, চোখ সারাক্ষণ রয়েছে যেদিক দিয়ে সে এসেছে সেদিকে। ভূতটার ছায়া দেখলেই উঠে দৌড় দেবে আবার।

আর দেখা দিল না ভূত। জিরিয়ে নিয়ে উঠল বব। সামনের পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা নারকেল গাছ। যাক, পানি পাওয়া যাবে। একটা নারকেল জোগাড়ের আশায় পা বাড়াল সে নারকেল-কুঞ্জের দিকে।

গাছের গোড়ায় একটা নারকেল দেখে কাছে এসে উবু হতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা, চাঁদের আলোয় চমকাচ্ছে ওটার শরীর। অবিশ্বাস্য। চোখ ডলে নিয়ে আবার তাকাল, না, আছে তো। ল্যাগুনের স্থির আলোয় ভাসছে একটা বিমান, চকচকে ডানায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়েছে ববের চোখে। একবারও মনে এল না তার, ওটাতে চড়েই রওনা দিয়েছিল, ওটা তাদেরই সেই উভচর সিকরস্কি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভাবল, প্লেনের লোকগুলো গেল কোথায়? নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও রয়েছে। সরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল, কিন্তু ল্যাগুনের ধারে খোলা ছোট্ট সৈকতে কাউকে চোখে পড়ল না। মনস্থির করে নিয়ে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল সে, ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। কাছেই আছে মানুষটা। নাক ডাকাচ্ছে।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল বব। কি করবে? ডাকবে মানুষটাকে! প্লেনটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা ভাবনা ঝিলিক দিয়ে গেল তার মনে। নির্জন এই দ্বীপে এই সময়ে প্লেন আসে কি করে? সিকরস্কিটা নাতো? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, চেনা চেনা মনে হচ্ছে এখন বিমানটাকে। আরও কয়েক মুহূর্ত পর আর সন্দেহ রইল না, ওটা সিকরস্কিই। আনন্দ চলে গেছে মন থেকে, তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে ভয়, সুযোগ দিলে ভয়টা আতঙ্কে রূপ নেবে। মন শক্ত করল সে। কি করবে? প্লেন চালাতে জানে না, যে ওটা নিয়ে পালাবে। তাহলে? হ্যাঁ, প্লেন চালাতে জানে না, কিন্তু নৌকা তো চালাতে পারে। রবারের ডিঙিটা নিয়ে চলে যেতে পারে কাছের অন্য কোন দ্বীপে, এমন কোনটায়, যেটাতে মানুষের বাস আছে। কিন্তু তার আগে লুকিয়ে দেখে নেবে, হ্যামার আর সঙ্গীরা কি করছে। পুবের আকাশ ফেকাসে হতে শুরু করেছে, মরে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা, ভোরের দেরি নেই। যা কিছু করার করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, আলো ফোটার আগেই।

নিঃশব্দে গাছপালার আড়ালে আড়ালে ঘুরে এসে দাঁড়াল পাথরের স্তূপের আড়ালে। আস্তে করে মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিল, যেদিক থেকে নাক ডাকার শব্দ আসছে সেদিকে। ঢিবঢিব করছে বুকের ভেতর। সামনে একটুখানি খোলা জায়গা। পাশাপাশি শুয়ে আছে ছয়জন। কিন্তু চারজন তো থাকার কথা। একজন নড়েচড়ে উঠল। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল বব। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সাবধানে আবার উঁকি দিল।

নড়ে উঠে এদিকে ফিরে শুয়েছে মূর্তিটা। খালি গা। চাঁদের আলো পড়েছে

মুখে। দেখেই চিনতে পারল তাকে বব। কিশোর! গলার কাছে চিৎকারটা প্রায় এসে গিয়েছিল ববের, কোনমতে থামাল। বুকের ভেতরে ঢিবঢিব বেড়ে গেছে। কিশোর, তারমানে তার পাশে শোয়া মূর্তিটা মুসার। বোঝা যাচ্ছে, দু'জনেরই হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে, তাদের পড়ে থাকার বেকায়দা ভঙ্গি দেখেই এটা স্পষ্ট।

সাহায্য করা দরকার ওদেরকে, কিন্তু কিভাবে? একটা ছুরির জন্যে এত আফসোস জীবনে আর কখনও করেনি বব। বাঁধনের গিঁট কি খুলতে পারবে? পারুক আর না পারুক, চেষ্টা করে দেখতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। আকাশের দিকে তাকাল। ইস, এত তাড়াতাড়ি আলো ফুটছে কেন? মনেই পড়ল না, এই খানিক আগেও বার বার বলেছে, কেন আলো ফুটতে এত দেরি হচ্ছে। যা কিছু করার খুব দ্রুত করতে হবে, ডাকাতগুলো জেগে যাওয়ার আগেই।

পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এল বব। কিশোরের চোখ মেলা, ববকে দেখছে চুপচাপ। জ্বলজ্বল করছে না? তাইতো মনে হয়, ভাবল বব। হাসল। তার হাসি কিশোরের চোখে পড়ল কিনা বোঝা গেল না।

কিশোরের পাশে এসে বসে পড়ল বব। পায়ের বাঁধনে হাত দিল। একবার চেষ্টা করেই দমে গেল। ভীষণ শক্ত করে বেঁধেছে। এই বাঁধন খুলতে অনেক সময় নেবে।

উঠে বসার চেষ্টা করছে কিশোর। বব ফিরে তাকাতেই ফিসফিস করে বলল, 'ক্ষুর!' মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল।

দেখতে পেল বব। খানিক দূরে চিত হয়ে শুয়ে আছে এক বেশালদেহী নিগ্রো, নীল জামা গায়ে, তার ছড়ানো হাতের কাছে পড়ে রয়েছে একটা ক্ষুর।

উঠে এগোল বব। ক্ষুরটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় খুলে গেল নিগ্রোর চোখ।

জঘন্য একটা মুহূর্ত একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল ওরা। গাল দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল ম্যাবরি।

'পালাও, বব, দৌড় দাও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

চমক ভাঙল যেন ববের, স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ক্ষুর হাতে উঠে পড়েছে নিগ্রো, সাঁই করে হাত চালাল, অল্পের জন্য বাঁচল ববের গলাটা। লাগলে ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেত মুণ্ডু। আর কি দাঁড়ায় সে সেখানে! আতঙ্কে চেঁচিয়ে দৌড় দিল তাড়া খাওয়া পাহাড়ী ছাগলের মত। সৈকত ধরে ছুটছে, পেছনে তাকানোর সাহস নেই, কোথায় কোনদিকে যাবে জানে না, শুধু বুঝতে পারছে, বাঁচতে চাইলে নিগ্রোর হাতে পড়া চলবে না। ধরে জবাই করে ফেলবে তাকে খুনেটা।

একটা পাহাড়ে উঠে পড়ল বব, উঠে চলল দ্রুত। পেছনে গুলির শব্দ হলো, ববের পায়ের কাছ থেকে উঠে গেল এক খাবলা মাটি। আরেকটা গুলি লাগল প্রথমটার কাছেই, আরেক খাবলা মাটি উড়ল। থামলো না বব। বড় একটা খাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়াতেই হলো অবশেষে। সামনে যাওয়ার পথ নেই। ফিরে তাকিয়ে দেখল, উঠে আসছে নিগ্রো।

ঘুরে এক পাশে ছুটল আবার বব। ঢুকে পড়ল ঘন জঙ্গলে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই বুঝল, ভুল জায়গায় ঢুকেছে। ঘন হয়ে জন্মানো লিয়ানা লতা আর কাঁটাঝোপের ভেতরে ছুটে চলা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আবার বেরিয়ে এসে বাঁ দিক দিয়ে খাদটা ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করল। জানে না, এটা সেই জায়গা, হ্যামারের তাড়া খেয়ে তার বাবাও একদিন যেদিক দিয়ে ছুটেছিল।

খাদ ঘুরে ছুটল বব, তাড়া করে আসছে নিগ্রো, অনেক কাছে এসে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে আবার বাধা পড়ল সামনে। জঙ্গলে ঢাকা একটা শুকনো খাঁড়িমত রয়েছে। ওটায় নেমে লুকিয়ে পড়া যায় না? এদিক ওদিক তাকাল সে। ছোট-বড় কয়েকটা গুহা চোখে পড়ল। সময় নেই। একটা গর্তে প্রায় লাফিয়ে নামল সে, ঢুকে বসে পড়ল। হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল, যাতে হাঁপানোর শব্দ শোনা না যায়।

খাঁড়ির পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাবরি, শব্দ শুনে বুঝতে পারল বব। এগিয়ে আসতে শুরু করল পাশের শব্দ, ববের গর্তটার দিকেই এগোচ্ছে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে বব। আর রক্ষা নেই, ধরা বুঝি পড়তেই হবে। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে পায়ের শব্দ, নিশ্চয় কোন গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে নিচ্ছে ম্যাবরি।

ববের গর্তটা বড় জোর পাঁচ কি ছয় ফুট গভীর, কিনারে এলে তাকে দেখতে পাবে ম্যাবরি। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করারও নেই।

এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ, ম্যাবরির ভারি শ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে এখন। আসছে···আসছে···তারপর থেমে গেল। ওপরে তাকাতে সাহস হচ্ছে না ববের, তবুও তাকাল। তার দিকেই চেয়ে রয়েছে নিগ্রোটা। দাঁত বের করে নীরবে হাসছে। ভয়ংকর ভঙ্গিতে হাতের তালুতে শান দিচ্ছে ক্ষুর।

গর্তের কিনারে লম্বা হয়ে শুয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল নিগ্রো। ববের চুল খামচে ধরে টান দিল। চিৎকার করে উঠল বব, ছটফট করছে, ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চুল ছেড়ে তার ঘাড় চেপে ধরে টেনে তুলে আনছে ম্যাবরি, জবাই করার জন্যে ছাগলের বাচ্চাকে তুলছে যেন।

গর্তের বাইরে ববকে বের করে আনল ম্যাবরি। দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুল খামচে ধরল আবার, টান দিয়ে মাথা পেছনে বাঁকা করতেই গলা ঠেলে এল সামনে। ক্ষুর চালানোর সুবিধে হবে। হাসিতে উজ্জ্বল ম্যাবরির মুখ চোখ জ্বলজ্বল করছে। ক্ষুর সোজা করল সে, এগিয়ে আনল ধীরে ধীরে। গলায় বসিয়ে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারবে। আতঙ্কে হাত দিয়ে গলা রক্ষা করার কথাও ভুলে গেছে বব, সম্মোহিতের মত চেয়ে রয়েছে নিগ্রোর চোখের দিকে।

ঠা-শ্-শ্ করে একটা শব্দ হলো। বব মনে করল, চাপের চোটে তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে। কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে না কেন? ক্ষুরই বা চালাচ্ছে না কেন নিগ্রোটা? আরে, চেহারা দেখি বদলে গেছে ব্যাটার হঠাৎ করে! হাসি মুছে গেছে। কেঁপে উঠল ম্যাবরির শরীর, হাত থেকে খসে পড়ে গেল ক্ষুর, পাথরে পড়ে শব্দ তুলল, ববের কানে মধুর বাজনার মত শোনাল সে শব্দ। তিন কি চার সেকেণ্ড ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল নিগ্রোটা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল পাথরের ওপর।

চোখের সামনে থেকে বাধা সরে যেতেই লোকটাকে দেখতে পেল বব,

ম্যাবরির ঠিক পেছনেই। ধরেই নিল বব, মরে গেছে সে, মৃতের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে, তাই এমন সব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখতে পাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই জলদস্যুর ভূত, বাঁ হাতে ভোজালি, ডান হাতে ধরা শত শত বছরের পুরানো পিস্তলের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বোবা হয়ে চেয়ে আছে বব। তার মগজ কাজ করতে চাইছে না যেন। কিন্তু একে একে দ্বিধার সমস্ত গিঁট ছাড়াল মগজ, খাপে খাপে বসিয়ে দিল সবকিছু।

চেঁচিয়ে উঠল বব, 'আপনি!'

তিন

ডুবতে ডুবতেও ভেসে রইল বিমানটা। দূর থেকে দেখে মুসা কিংবা কিশোর যতখানি খারাপ ভেবেছে, ঠিক ততখানি খারাপ অবস্থায় নেই ওমর। কারণ সহজে ডুববে না বিমান, ভেতরে বাতাস ঢুকে আটকে গেছে, ভেসে রয়েছে ওই বাতাসের জন্যেই। ছোট একটা উপদ্বীপ বা পাথরের অনেক বড় স্তূপ, যা-ই বলা যাক, ওটার দিকে ভেসে চলেছে বিমান, মূল দ্বীপের এক মাথা থেকে বড়জোর শ'দুয়েক গজ দূরে, তার পরে খোলা সাগর।

উদ্বিগ্ন হয়ে উপদ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওমর। আশা, যদি কোনভাবে ওটাতে উঠে ঢেউ ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে, তো বেঁচে যাবে এযাত্রা। তারপর ঝড় কমলে সাঁতরে চলে যেতে পারবে মূল দ্বীপে। কিন্তু কাছে যাবে কি বিমানটা?

যেতে পারে, না-ও পারে, ফিফটি ফিফটি চান্স। একবার তো উপদ্বীপের একেবারে কয়েক গজের মধ্যে চলে এল, কিন্তু ওমর ঝাঁপ দিয়ে পড়ার আগেই বিপরীতমুখী স্রোতের টানেই হোক, কিংবা বাতাসের ঝাপটায়ই হোক, দ্রুত সরে চলে এল আবার। খানিক পরে আবার এগোল বিমান, আবার পিছিয়ে এল। তারপর আবার এগোতে শুরু করল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওমর, ঝুঁকিটা নেবে, ঝাঁপ দিয়েই পড়বে পানিতে, তারপর সাঁতরে তীরে ওঠার চেষ্টা করবে, এছাড়া উপায় নেই। ও যা ভেবেছে—, উপদ্বীপের একেবারে গায়ে বাড়ি খাবে বিমান, তা হবে না। বেশি সুবিধার জন্যে অপেক্ষা করলে শেষে আর কাছে না গিয়ে যদি স্রোতের টানে খোলা সাগরে ভেসে যায়, তাহলে সামান্য যে সুযোগ আছে, সেটাও মিলবে না।

তৃতীয়বার কাছাকাছি হতেই ঝাঁপ দিল ওমর। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরাতে শুরু করল। কোনমতে এসে ধরে ফেলল বেরিয়ে থাকা একটা চোখা পাথর। ঢেউ আসছে, শব্দ শুনেই বুঝতে পারছে। লম্বা শ্বাস টেনে নিয়ে দম বন্ধ করে জোরে প্রায় জড়িয়ে ধরে রইল পাথরটা। এসে গেল ঢেউ, চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কিন্তু সরার নাম নেই আর। দম ফুরিয়ে আসছে, বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস, আর পারছে না সে। সরল ঢেউ। এত জোরে টান দিল, ওমরের মনে হলো, গোড়া থেকে তার বাহু দুটো ছিঁড়ে শরীরটা নিয়ে চলে যাবে পানি। কিন্তু তার প্রচণ্ড মনোবলের কাছে হার মানল ঢেউ, নিতে পারল না।

ঢেউ সরে যেতেই পাথর ছেড়ে দিল ওমর, বুক সমান পানিতে এখন সে, টান

পুরোপুরি কমেনি। আবার হাত-পা ছুঁড়ে অবশেষে উঠে এল উপদ্বীপে। পাথর ধরে ধরে উঠল ওপরে, ঢেউয়ের নাগালের বাইরে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে শরীর।

কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল ওমর। জিরিয়ে নিয়ে উঠে বসে তাকাল। উপদ্বীপে সাগরের দিকটায় উঠেছে সে। উঠতে শুরু করল চূড়ায়, ওখান থেকে দেখা যাবে মূল দ্বীপটা, মুসা আর কিশোরকে দেখতে পাওয়ার আশাও করছে।

কিন্তু চূড়ায় পৌঁছার আগেই অবাক হতে হলো তাকে। হঠাৎ আবিষ্কার করল, যে পাথর ধরে ধরে উঠে যাচ্ছে সে, ওগুলোতে মানুষের অস্ত্র লেগেছে। বড় পাথর কেটে ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের টুকরো করে সেগুলো দিয়ে একটা বুরুজ মত বানানো হয়েছে। বুরুজের ওপরে ওঠার পথ খুঁজে বের করল সে। উঠে এল। অবাক হয়ে দেখল, পুরানো আমলের একটা দুর্গের ভাঙা চত্বরে উঠে এসেছে। গোটা ছয়েক পুরানো কামানও বসানো রয়েছে, কয়েকটা সাগরের দিকে মুখ করা, কয়েকটা ডাঙার দিকে। কাঠের বড় বারকোশে জমিয়ে রাখা হয়েছে বড় বড় গোলা, কামানের গোলা। দুর্গটা তৈরি হয়েছিল নিশ্চয় সেই আমলে, যখন বাক্যানিয়ারদের সঙ্গে স্প্যানিশদের যুদ্ধ চলছিল।

চত্বরের এক ধার থেকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি, পাহাড়ের ভেতরে ঢুকেছে। ভেতরে কি আছে, দেখার কৌতূহল হচ্ছে বটে, কিন্তু দেখতে যাওয়ার সময় এটা নয়। উঠে এল একেবারে চূড়ায়, এখান থেকে মূল দ্বীপ দেখা যায়। সৈকত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যতদূর চোখ যায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মুসা আর কিশোরের কি হলো? নিচে তাকাল ওমর। দ্বীপে আর উপদ্বীপের মাঝের সরু প্রণালীতে এখন উথাল-পাতাল ঢেউ, ভীষণ অবস্থা। এখন ওটা সাঁতরে পেরোনোর চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

মন খারাপ হয়ে গেছে ওমরের। ববকে হারিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। মুসা আর কিশোরের কি হয়েছে, বুঝতে পারছে না। দু'দুটো বিমান হারিয়ে সে আটকা পড়েছে এক দ্বীপে, সঙ্গে খাবার নেই, পানি নেই, অস্ত্র নেই।

আলো কমছে দ্রুত, শিগগিরই অন্ধকার হয়ে যাবে। ঝড় থেমেছে, কিন্তু সাগরের ফোঁস ফোঁস বন্ধ হয়নি। প্রণালীটা সাঁতরে পেরোনোর সময় হয়নি এখনও, দেরি আছে। দিগন্তে হঠাৎ করে উদয় হলো সূর্য, কালো মেঘের ফাঁকে। লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ল মূল দ্বীপের চন্দ্রাকৃতি মাথায়, রাঙিয়ে লাল করে দিল। অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু দেখার মন নেই ওমরের। সে ভাবছে কিশোর আর মুসার কথা। কি হলো ওদের? বেঁচে আছে তো? নাকি ববের মত তাদেরকেও নিয়ে গেছে উন্মত্ত সাগর?

খামোকা বসে থাকার চেয়ে আশপাশটা ঘুরে দেখা উচিত মনে করল ওমর। যেখানে বসে আছে, ওখান দিয়ে নামতে পারবে না প্রণালীতে, খাড়া পাহাড়। ঢালু জায়গা বের করতে হবে। নেমে চলে এল আরেক দিকে। আরে, সিঁড়ি যে একেবারে তৈরিই করে রেখেছে। মালপত্র নিয়ে জাহাজ আসত, সেসব মালপত্র তোলার জন্যেই তৈরি হয়েছিল এই সিঁড়ি। হঠাৎই মনে পড়ল তার, পানি। নিশ্চয় পানি

রাখার ব্যবস্থা আছে কোথাও দুর্গে। এসব পাথুরে জায়গায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্যে ট্যাংক খোঁড়া হয় পাথরের তলায়, একটা বা বেশ কয়েকটা নালা কেটে পথ করে দেয়া হয়, সেই পথ দিয়ে গিয়ে বৃষ্টির পানি জমা হয় ট্যাংকে। পানির কথা মনে হতেই তৃষ্ণা টের পেল সে, এতক্ষণে খেয়াল করল, নোনা পানি শুকিয়ে চড়চড় করছে মুখ। ঠিক আছে, আগে পানির খোঁজই করবে। আবার সেই চত্বরে চলে এল সে, যেখানে কামানগুলো রয়েছে, যেখানে একপ্রান্ত থেকে সিঁড়ি নেমে ঢুকেছে পাহাড়ের গভীরে।

সিঁড়ি বেয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল সে। যতই নামছে, বাড়ছে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না। খুব সাবধানে এক পা এক পা করে বাড়িয়ে দিয়ে নেমে চলল। যতক্ষণ সিঁড়ি আছে, নামবে, তারপর কিছু না পেলে ফিরে উঠে আসবে। কিন্তু আরও কয়েক ধাপ এগোতেই আলো চোখে পড়ল। খুব কায়দা করে সুড়ঙ্গ কেটে আলো আনার ব্যবস্থা হয়েছে। আলো আনার জন্যেই, না-কি অন্য কোন ব্যাপার? যা-ই হোক, পরে দেখা যাবে। আপাতত বড় একটা কামরায় এসে ঢুকেছে সে। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে এই পাতালকক্ষ। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওমরের। অদ্ভুত এক অনুভূতি। লাফ দিয়ে কয়েকশো বছর পেরিয়ে অতীতে চলে এসেছে যেন সে! আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা।

অনুমান করল ওমর, চল্লিশ ফুট চওড়া আর চল্লিশ ফুট প্রশস্থ হবে কামরাটা। ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কোন কারণে খুব তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়েছিল এর অধিবাসীরা, সোজা কথা, পালিয়েছিল। পুরানো আমলের একগাদা কাপড় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে এক কোণে। লূপহোলে আটকানো একটা তামার সুইভেল-গানের ওপর পড়ে আছে কিছু কাপড়। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে দু'টো কঙ্কাল, পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় খুব কষ্ট পেয়ে মরেছিল। একটা কঙ্কালের হাতের আঙুলের কাছে পড়ে রয়েছে মস্ত এক ভোজালি। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে ক-য়েকটা পিস্তল আর মাসকেট বন্দুক। আর আছে ছ'টা পিপে। দেখা গেল, চারটে পিপেতে খাবার ছিল—তিনটেতে মাংস, শুকনো হাড়গুলো শুধু অবশিষ্ট রয়েছে আরেকটাতে ময়দা—নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি দুটোতে ছিল বারুদ, কিছু তলানি এখনও আছে। ঘরের আরেক কোণে ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে ছোট গোল মার্বেলের মত কিছুর স্তূপ। এক মুঠো হাতে নিয়েই আবার ফেলে দিল ওমর। ওজনেই বোঝা গেছে কি জিনিস। গুলি। মাসকেটের হতে পারে, কিংবা সুইভেলগানের। কিন্তু পানির ট্যাংকের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না।

আবার কঙ্কাল দুটোর দিকে তাকাল সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। কারা ওরা? বাড়ি কোথায়? কি কারণে এসেছিল এখানে? কোন দিনই জানবে না হয়তো, জানবে না কেউই। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ঘুরে এগোল সিঁড়ির দিকে। মাঝপথে থেমে কি ভাবল, তারপর ফিরল কাপড়ের স্তূপের দিকে। প্রায় উলঙ্গ হয়ে রয়েছে সে। কাপড় যখন আছে, কেন পরবে না? বাইরে বেরোলেই হয়তো ছেঁকে ধরবে মশার পাল, খালি গায়ে থাকলে অতিষ্ঠ করে ফেলবে।

বেছে বেছে একটা ফতোয়ার মত পোশাক তুলে নিল সে, বুকের কাছে সুতোর

দড়ির জালি। লালচে একটা পাজামা নিল, আর একটা ছিট কাপড়ের রুমাল। পুরানো, নোনা গন্ধ, কিন্তু গন্ধটা আপাতত সহ্য করল ওমর। খোলা বাতাস আর রোদ লাগলে চলে যাবে গন্ধ, আঠা আঠা ভাবটাও থাকবে না। আর তেমন বুঝলে ধুয়ে নিতে পারবে যখন-তখন। কাপড় যখন পাওয়া গেছে, খালি গায়ে থাকার কোন মানে হয় না।

কাপড়গুলো পরে নিয়ে খুঁজে খুঁজে পায়ের মাপমত একজোড়া বুট বের করল। একটু টুকরো তারপুলিনও পাওয়া গেল। ওমরের মুখে ফুটেছে অদ্ভুত হাসি। একটা পিস্তল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল, ঠিকই আছে মেকানিজম। কয়েকবার স্লাইড টেনে ট্রিগার টিপে হ্যামারের আঘাত দেখল, নাহ্, গুলি ফাটাতে পারবে মনে হচ্ছে। কিছু গুলি নিল। বারুদ রাখার বিশেষ বোতলে ভরতি করে নিল বারুদ। এক সময় নরম চামড়া দিয়ে তৈরি হয়েছিল বোতলটা, এখন লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে, তবে কাজ চলবে। আর কিছু নেয়ার আছে? আছে, তবে তারপুলিনে বাঁধতে হবে না। পিস্তল, গুলি, জুতো আর বারুদের বোতল তারপুলিনে রেখে কোণাগুলো এক করে পোঁটলা বাঁধল। কঙ্কালের হাতের কাছে পড়ে থাকা ভোজালিটা নিয়ে গুঁজল কোমরে। তারপর পোঁটলাটা হাতে ঝুলিয়ে পা বাড়াল আবার সিঁড়ির দিকে। মুখে হাসি।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, অনেক নেমে গেছে পানি। খুব সহজেই পেরোতে পারবে এখন প্রণালী। সুবিধামত একটা দিক খুঁজে বের করল। নিচু একটা দেয়াল ডিঙিয়ে যেতে হবে। পেরিয়ে এল সহজেই। পানিতে নামল।

চিত-সাঁতার দিয়ে এগুলো ওমর, দু'হাতে উঁচু করে ধরে রেখেছে পোঁটলাটা, যাতে পানি না লাগে। সহজেই পেরিয়ে এল প্রণালী, পোঁটলা ভিজল না। তীরে উঠে পরনের কাপড় খুলে চিপে পানি ঝরিয়ে নিয়ে আবার পরল।

চাঁদ উঁকি দিচ্ছে দিগন্তে। চারদিক বড় বেশি নীরব, শান্ত। বনের দিকে তাকাল। কি বিপদ লুকিয়ে রয়েছে ওই গাছের দঙ্গলের মধ্যে? জানে না। সাবধান থাকা দরকার। পোঁটলা খুলে আগে গুলি আর বারুদ ঠাসল পিস্তলে। বুট পরে পাজামার নিচের দিক গুঁজে দিল বুটের ভেতর। তারপুলিন দিয়ে বোতলটা বেঁধে নিল কোমরের সঙ্গে। তারপর পিস্তল আর ভোজালি হাতে চলল শেওলায় ঢাকা পাথরটা খুঁজতে, যেটার ওপর নামতে চেয়েছিল কিশোর আর মুসা।

পাথরটার আশপাশ খুঁজল ওমর। বালিতে পড়ে থাকা ববের জ্যাকেটা দেখতে পেল। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। এগিয়ে চলল আবার এক দিকে। খানিক দূর এগোনোর পর সামনে দেখতে পেল পাথরের স্তূপ। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল। ভাবল, ওদিকে যেতে পারবে না মুসা কিংবা কিশোর, আবার ফিরল সে। ফিরে এল সৈকতে, যেখানে উঠেছিল প্রথমে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই কয়েকটা নারকেল পেয়ে গেল, ঝড়ে গাছ থেকে খসে পড়েছিল সাগরে, ঢেউ আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তীরে। ভোজালি দিয়ে নারকেল কেটে আগে পানি খেল, তারপর ধীরেসুস্থে খেল ভেতরের নরম মিষ্টি শাঁস। পেটে কিছু পড়তেই ক্লান্তি এসে চেপে ধরল। চিত হয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল সে।

কিন্তু এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না চোখে। ভাবছে। কি হলো ছেলে দুটোর? বেঁচে আছে ওরা? নানারকম দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করল মনে। ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে আসতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ওমর। চোখ মিটমিট করছে, কোথায় আছে বুঝতে পারছে না। দু'য়েক সেকেণ্ড লাগল পূর্ণ সচেতনতা ফিরে আসতে। একটা শব্দ সে শুনেছে নিশ্চয়, কিসের শব্দ? এদিক ওদিক তাকাল, দৃষ্টি আটকে গেল পঞ্চাশ গজ দূরে। পাহাড়ের ওপরে উবু হয়ে বসে কি যেন তোলার চেষ্টা করছে বিশালদেহী এক নিগ্রো। কৌতূহল হলো, উঠে পায়ে পায়ে এগোল সেদিকে ওমর।

একটা ছেলেকে তুলে আনল নিগ্রো, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না ওমর। বব! নিগ্রোর হাতে কি যেন চকচক করছে। চকিতে মনে পড়ে গেল ওমরের, ক্ষুর, ম্যাবরি। ছুটল সে নিঃশব্দে।

দশ গজ দূরে থাকতে থমকে দাঁড়াল ওমর। আর দেরি করা যায় না। পিস্তল তুলে নিশানা ঠিক করে দিল ট্রিগার টিপে। গুলি ফুটবে কিনা, অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু ফুটল গুলি।

আবার দৌড় দিল ওমর। ছুটতে ছুটতেই দেখল টলে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ম্যাবরি।

চার

ঝুঁকে ববের হাত ধরে তাকে টেনে তুলল ওমর। 'লেগেছে কোথাও?...ইস্, বড় সময়মত এসে পড়েছিলাম, আরেকটু দেরি করলেই...'

মাথা ঝোঁকাল বব। কথা বলতে পারছে না।

পুব আকাশ লাল হয়ে আসছে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে বব, তার কাঁধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল ওমর, 'আরে, কি করছ? মূর্ছা যাওয়ার সময় হলো এটা?...সোজা, সোজা হও।'

মলিন হাসি হাসল বব। 'সরি।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। পা কাঁপছে। বাঁচব ভাবিনি।'

'হ্যাঁ, মস্ত ফাঁড়া গেছে,' বলল ওমর। চোখ পড়ল একটা জিনিসের দিকে। 'আরে, দেখো! দেখেছ?'

দেখল বব। নিগ্রোর ডান হাতের আঙুলের কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়ে রয়েছে ছোট্ট গোল সোনালি একটা জিনিস, মোহর। সেই ডাবলুনটা।

'বলেছিলাম না,' ওমর বলল, 'মোহরটা অভিশপ্ত। যার হাতেই যায়, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে। ববকে মোহরটার দিকে এগোতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'না না, ছুঁয়ো না! ছুঁয়ো না!'

'এখানে ফেলে যাব?'

মাথা নাড়ল ওমর, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। 'এখানে নয়, চোখের আড়ালে। ওটাকে দেখলেও ক্ষতি হতে পারে, জিনের আসর আছে ওটাতে,' মোহরটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। এক লাথি দিয়ে ফেলে দিল একটা গর্তে,

এটাতেই লুকিয়েছিল বব। গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল মোহরটা। বিড়বিড় করে বলল ওমর, 'যাক, গেল আপদ।' ববের দিকে ফিরল। 'তোমাকে আবার দেখব, আশা করিনি, বব। খুব খুশি লাগছে। মুসা আর কিশোরের যে কি হলো?'

'আমি দেখেছি ওদের!' জানাল বব। 'ওদের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিলাম। ওই সময় এই লোকটা জেগে উঠে তাড়া করল!'

'বেঁচে আছে ওরা? ইয়াল্লাহ্!' অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এল ডাকটা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর।

'আছে, তবে বন্দি,' বলল বব।

'বন্দি?'

সংক্ষেপে সব কথা জানাল বব।

ববের কথা শেষ হতে আরেকবার লম্বা শ্বাস ফেলল ওমর। 'মুক্ত করতে হবে ওদের। চলো, এখুনি।'

নিগ্রোর দেহটা দেখাল বব। 'এটার কি হবে?'

'ওর সৎকার করার সময় নেই এখন,' ঠাণ্ডা ওমরের কণ্ঠ, 'ওর দোস্তরাই যা করার করবে।' কথা বলতে বলতেই আবার গুলি আর বারুদ ঠেসে নিল পিস্তলে। 'ক্ষুরটা নাও। মুসা আর কিশোরের বাঁধন কাটা যাবে।'

'ওমরভাই, এই কাপড় পেলেন কোথায়?' আর জিজ্ঞেস না করে পারল না বব। 'বুঝতে পারছি, গতরাতে আপনাকেই দেখেছিলাম,' চাঁদের আলোয় ভূতের ভয়ে ছোটার কথা মনে পড়তেই হেসে ফেলল। 'জলদস্যুর ভূত ভেবেছিলাম।'

ওমরও হাসল। 'পুরানো একটা দুর্গ আছে, উপদ্বীপে। এসব জিনিস ওখানেই পেয়েছি। কিন্তু এখন সব কথা বলার সময় নেই। কিশোর আর মুসাকে ছাড়িয়ে আনা দরকার। এসো, যাই।'

'পুরো দলটাকে আক্রমণ করবেন?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল বব, সৈকত ধরে চলেছে ওরা ল্যাগুনের উদ্দেশে।

'জানি না। লুকিয়ে থেকে আগে দেখব অবস্থা, পরিস্থিতি বুঝে যা করার করব,' বলল ওমর। 'প্রয়োজন হলে আক্রমণ করতেই হবে। তবে একটা লোককে নিয়ে সমস্যা, ইমেট চাব। রিভলভারে হাত নাকি তার খুবই ভাল। আমার এটা আদিম পিস্তল। এ-জিনিস নিয়ে ওর মুখোমুখি হতে পারব না। এটা হাতে আছে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এই আর কি। বারো গজ দূর থেকে নিশানা ঠিক রাখা যাবে না...,' থমকে গেল সে হঠাৎ। 'কে জানি আসছে?'

সামনে একটা পাথরের স্তূপের ওপাশ থেকে আসছে শব্দ। স্তূপটার ওপর উঠে সাবধানে উঁকি দিল ওমর। পরক্ষণেই লাফিয়ে নেমে ববের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'জলদি! জঙ্গলে!'

ববকে টেনে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওমর। কাঁটার খোঁচায় দু'জনেরই চামড়া ছিঁড়ে গেল জায়গায় জায়গায়।

'কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বব।

'ইমেট চাব বোধহয়, হাতে রিভলভার। হ্যাঁ, ও-ই। এদিকে আসছে, নিগ্রোটাকে খুঁজছে, কিংবা হয়তো গুলির শব্দ শুনে সন্দেহ করেছে। চুপ করে থাকো।'

'ও দলছুট হলে আমাদের জন্যে ভালই,' ফিসফিস করে বলল বব।

মাথা নোয়াল ওমর। ঠোঁটে আঙুল রাখল। 'শ্‌শ্‌শ্‌।'

গাছের আড়াল থেকে ইমেট চাবকে দেখতে পাচ্ছে দু'জনে। পাথরের স্তূপটার চূড়ায় উঠে মুখ ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখল সে। চেঁচিয়ে ডাকল, 'ম্যাবরি। এই ম্যাবরি।' তারপরই দেখতে পেল পাহাড়ের ওপর পড়ে থাকা নিগ্রোকে। গাল দিয়ে উঠে স্তূপ থেকে নেমে ছুটল সেদিকে।

'এসো, এই আমাদের সুযোগ,' উঠে দাঁড়াল ওমর। জঙ্গলের ভেতর দিয়েই কোনমত পথ করে এগোল। ইচ্ছে, গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে পাথরের স্তূপটার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ওপাশে। তাহলে আর তাদেরকে দেখতে পাবে না ইমেট চাব।

কিন্তু যে পরিমাণ লতা আর কাঁটা, নিঃশব্দে এগোনো অসম্ভব, এর ভেতর দিয়ে এগোনো সাংঘাতিক কঠিন। যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করে এগোল ওরা।

স্তূপটার পাশ কাটিয়ে এসে ঝোপ সরিয়ে মুখ বের করল ওমর। ববকে জিজ্ঞেস করল, 'শেষ কোন্ জায়গায় দেখেছিলে ওদের?'

আরেকটা পাথরের স্তূপ দেখাল বব। পাথর আর ভূমিধস নেমেছিল ওখানে কোন আদিমকালে, নারকেল গুচ্ছ গজিয়েছে এখন। 'ওটার ওপাশে।'

'এসো। ইমেট চাব আসার আগেই কাজ সারতে হবে আমাদের,' পাশে তাকিয়ে ইমেট চাব আসছে কিনা দেখল। 'দৌড় দাও।'

নিরাপদেই ভূমিধসটার কাছে চলে এল ওরা। আরেকবার পেছনে তাকিয়ে দেখল ওমর, ইমেট চাবকে দেখা যাচ্ছে না। 'বব, এবার তোমার পালা। এখুনি মুক্ত করতে না পারলে আর কখনও পারব না। পিস্তল দেখিয়ে আটকে রাখব আমি বারডু আর হ্যামারকে। তুমি কিশোর আর মুসার বাঁধন কাটবে। মাথা নিচু রাখবে, যে কোন সময় গোলাগুলি শুরু হতে পারে। যা-ই ঘটুক, তুমি কোন দিকে তাকাবে না, ওদের বাঁধন না কাটা পর্যন্ত। ওদেরকে ছাড়াতে পারলেই প্লেনটা আবার দখল করব। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'গুড। এসো, যাই।'

এক হাতে পিস্তল আরেক হাতে ভোজালি নিয়ে পাথরের দ্বিতীয় স্তূপটার চূড়ায় উঠে গেল ওমর। শক্ত করে ক্ষুর চেপে ধরে বব অনুসরণ করল তাকে। বিমানটা দেখা যাচ্ছে, সৈকতে পড়ে থাকা রবারের ডিঙিটাও, কিন্তু মানুষ নেই।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ববের দিকে তাকাল ওমর।

আরও কয়েকটা বড় পাথর দেখিয়ে বলল বব, 'ওগুলোর ওপাশে। ওখানেই ক্যাম্প করেছে ব্যাটারা।'

নিঃশব্দে নেমে এল ওরা স্তূপের ওপর থেকে। নরম বালি মাড়িয়ে কুঁজো হয়ে

ছুটল। বড় পাথরগুলোর কাছে এসে আস্তে করে উঁকি দিল। বড় জোর ছয় কদম দূরেই রয়েছে ওরা। পায়ের ওপর পা রেখে আরাম করে বসে একটা টিন থেকে কি নিয়ে খাচ্ছে হ্যামার। কিশোর আর মুসার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তেমনি পড়ে রয়েছে মাটিতে। সিডনি বারডুকে দেখা যাচ্ছে না।

পিস্তল নিশানা করল ওমর। হেঁকে বলল, 'হাত দুটো তোলো, মিস্টার হ্যামার। শয়তানী করলেই খুলি উড়িয়ে দেব। সন্দেহ থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারো।' ববের দিকে ফিরে নিচু গলায় বলল, 'যাও।'

ফিরে তাকাল হ্যামার, এতোই অবাক হয়েছে, হাস্যকর দেখাচ্ছে তার গরিলার মত মুখটা। কোনরকম শয়তানীর চেষ্টা করল না সে। হাত থেকে টিনটা ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল দুই হাত।

শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে হ্যামারের মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকাল ওমর। 'শান্ত থাকো।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বারডুকে খুঁজল। নেই। তাকাল ববের দিকে, মুসার বাঁধন কাটা সারা, কিশোরের বাঁধন কাটছে দ্রুত হাতে।

মুক্ত হয়েও দাঁড়াতে পারল না কিশোর। গোড়ালি ডলছে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

কঠিন হয়ে গেল ওমরের মুখ। 'বব। এদিকে এসো।'

দৌড়ে এল বব।

'পিস্তলটা ধরো,' বলল ওমর। 'ব্যাটা একটু নড়লেই দেবে ট্রিগার টিপে।' ববের হাতে পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে হ্যামারের পকেট হাতড়াতে শুরু করল সে।

একটা রিভলভার পাওয়া গেল, বাঁ হাতে নিল সেটা। দরকার নেই, তবু কি ভেবে নকল ম্যাপটা বের করে নিজের পকেটে রাখল। তারপর উঠে গেল মুসা আর কিশোরের কাছে। কিশোর তো পারছেই না, মুসাও দাঁড়াতে পারছে না ঠিকমত। কব্জি আর গোড়ালি ডলছে। দীর্ঘ সময় রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাংঘাতিক ফুলে উঠেছে জায়গাগুলো। ওদের ঠিক হতে আরও কয়েক মিনিট লাগবে।

'ঠিক আছে, বসো,' হাত তুলে বলল ওমর। 'ভালমত ডলো। বেশি দূর না, ডিঙিটার কাছে যদি যেতে পারো, তাহলেই চলবে। জানিও, কখন পারবে।'

'বিমানটা দখল করবেন আবার, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিশ্চই,' সঙ্গে সঙ্গে বলল ওমর। 'আমাদের জিনিস...,' থেমে গেল সে। ঝট করে মাথা ফেরাল বিমানটার দিকে।

স্টার্ট নিয়েছে উভচরের ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল প্রবাল প্রাচীরের দিকে। এক পাশের খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে খোলা সাগরে। জানে লাভ নেই, তবু দৌড় দিল ওমর। কিন্তু দশ পা এগোতে না এগোতেই গতি বেড়ে গেল বিমানের, পানিতে ঢেউ তুলে ছুটে গেল দ্রুত গতিতে।

বন্ধুদের কাছে ফিরে এল ওমর। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'বারডু হারামজাদা। একবারও ভাবিনি ও প্লেনে উঠে বসে আছে।'

শূন্যে উঠল উভচর। উৎফুল্ল চোখে সেটার দিকে চেয়ে রইল হ্যামার।

রেগে গেল ওমর আরও। চোখের পাতা কাছাকাছি হলো। 'দাঁড়াও, শয়তানের

বাচ্চা, তোমার নিজের ওষুধই তোমাকে দেব। আশা করি অসুবিধে হবে না,' প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে বেদুঈনের চোখ। 'মুসা, উঠতে পারবে? দড়ি দিয়ে ব্যাটার হাত-পা বাঁধো কষে।'

হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ও-কে, বস্।'

'বব,' বলল ওমর, 'যাও তো, স্তূপের চূড়ায় উঠে দেখো, ইমেট চাব আসছে কিনা। পিস্তলটা কিশোরের হাতে দাও, গরিলার বাচ্চা বাধা দিলেই দেবে গুলি মেরে।'

কিশোরের হাতে পিস্তল দিয়ে স্তূপের দিকে দৌড়ে গেল বব। ওপরে উঠে একবার চেয়েই ছুটে ফিরে এল। 'আসছে! আসছে!'

ফিরে চাইল ওমর। 'কত দূরে?'

'একশো গজ হবে। খুব আস্তে আস্তে আসছে, ম্যাবরিকে নিয়ে আসতে হচ্ছে তো।'

দ্রুত চিন্তা চলেছে ওমরের মাথায়। 'সবাই তৈরি হয়ে যাও। পালাতে হবে আমাদের।'

ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'ইমেটের ভয়ে পালাব?'

'হ্যাঁ,' বলল ওমর, 'অহেতুক ঝুঁকি নিতে যাব কেন? রিভলভারে হাত খুব ভাল ওর। ওর মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার, অন্তত রিভলভার নিয়ে। গুলি খেয়ে না মরলেও আহত হতে পারি, আমাদের যে কেউ। এই বিজন অঞ্চলে তখন আরও বিপদে পড়ব, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। চলো, ভাগি। জলদি করো।'

পাথরের স্তূপের দিকে তাকাল কিশোর, পেছনে ঘন বনের দিকে চাইল। ওমরের দিকে ফিরে বলল, 'যাব কোন দিক দিয়ে?'

'ওদিক,' সাগরের দিকে হাত তুলল ওমর। 'বব, মুসা, জলদি গিয়ে ডিঙি নামাও পানিতে। কিশোর, এদিকে এসো, আমাদের জিনিস আমরা নিয়ে যাই।' প্রথমেই খাবারের টিনগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে শুরু করল সে।

ওমর আর কিশোর মিলে খাবারের টিন বয়ে এনে তুলতে লাগল নৌকায়। সব তুলতে পারল না, তবে যত বেশি পারল, তুলল। কিশোর উঠে পড়ল। ডিঙিটা গভীর পানির দিকে ঠেলে দিয়ে আলগোছে লাফিয়ে উঠে বসল ওমর। পানি থেকে বড়জোর ইঞ্চি দুই ওপরে রয়েছে ডিঙির কানা, তবে এখন সাগর শান্ত, আরোহীরা বেশি নড়াচড়া না করলে ডুববে না নৌকা।

'ভেবেছ পার পেয়ে যাবে,' চেঁচিয়ে বলল হ্যামার। 'এত সহজ না। দেখাব মজা।'

'আমরা অপেক্ষায় থাকব,' চেঁচিয়েই জবাব দিল ওমর, বৈঠা তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেলল পানিতে।

'ইমেট, এই ইমেট!' চেঁচামেচি শুরু করল হ্যামার। 'কোথায় তুমি? জলদি এসো। ব্যাটারা পালাল!'

পাথরের স্তূপের ওপাশ থেকে সাড়া দিল ইমেট চাব।

'শান্ত থাকবে,' সঙ্গীদেরকে হুঁশিয়ার করল ওমর, 'ইমেট চাব গুলি চালালেও

নড়বে না কেউ। নড়াচড়ায় ডিঙি ডুবে গেলে আর রক্ষে থাকবে না।'

স্তূপের মাথায় দেখা গেল ইমেট চাবকে, প্রায় একশো গজ দূরে চলে এসেছে ততক্ষণে ডিঙি।

'ও দেখে ফেলেছে আমাদের,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

রিভলভার হাতে পানির ধারে দৌড়ে আসছে ইমেট চাব, যতখানি সম্ভব কাছে থেকে গুলি করতে চায়।

'আসুক, অনেক দূরে চলে এসেছি,' বলল ওমর। 'যত ভাল হাতই হোক, পঞ্চাশ গজের পরে রিভলভার দিয়ে নিশানা ঠিক রাখা খুব কঠিন।'

পানির ধারে চলে এল ইমেট চাব। গর্জে উঠল তার রিভলভার। ডিঙি থেকে কয়েক ফুট দূরে পড়ল বুলেট, পিছলে উড়ে চলে গেল সাঁ করে।

দাঁড় বাইতে বাইতে কিশোরকে বলল ওমর, 'গুলি করো। জানি লাগবে না, তবু অস্বস্তিতে পড়ুক। পাল্টা গুলির মুখে দাঁড়িয়ে হাত স্থির রাখতে পারবে না।'

গর্জে উঠল আদিম পিস্তল। পাথরে বাড়ি লেগে বিইঙ করে উড়ে চলে গেল বুলেট, এত দূর থেকেও সে শব্দ শোনা গেল।

কিন্তু ঘাবড়াল না ইমেট চাব, একের পর এক গুলি করে গেল। একটা গুলিও লাগাতে পারল না। ইতিমধ্যে আরও দূরে সরে এসেছে ডিঙি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল সে হ্যামারের বাঁধন খুলতে।

ডিঙির নাক বাঁয়ে ঘোরাল ওমর, তীরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখে এগিয়ে চলল।

'কোথায় যাচ্ছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'দ্বীপের শেষ মাথায় একটা উপদ্বীপ দেখেছ? এখান থেকে আধমাইল মত হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের জন্যে সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। ওখান থেকে চারদিকে লক্ষ্য রাখতে পারব। লুকিয়ে এসে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারবে না হ্যামারের দল। গিয়ে আগে কিছু মুখে দিয়ে নেব, তারপর মিটিঙে বসব। সামনে অনেক কাজ।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ওমরভাই, ওই পোশাক কোথায় পেলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

কড়া হয়েছে রোদ। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ওমর। 'গেলেই দেখবে। আচ্ছা, হ্যামারের দল থেকে দূরে থাকতে পারলে না?'

'হঠাৎ করেই ধরা পড়ে গেলাম, ওমরভাই,' জবাব দিল মুসা। 'কল্পনাও করিনি ওভাবে ধরা পড়ব।'

আর কোন কথা হলো না। চুপচাপ দাঁড় বেয়ে চলল ওমর। ল্যাগুনের ধারে বালিয়াড়িতে দেখা যাচ্ছে হ্যামার আর ইমেট চাবকে, ডিঙির দিকেই ফিরে আছে। ঘুরে উপদ্বীপের অন্য দিকে নৌকা নিয়ে এল ওমর, খোলা সাগরের দিকে। এখান থেকে দেখা যায় না ল্যাগুনটা। আস্তে আস্তে দাঁড় বেয়ে ডিঙিটাকে নিয়ে এল সিঁড়ির গোড়ায়, যেখানে জাহাজ থেকে মালখালাস করা হত এককালে।

'জিনিস নিয়ে উঠে যাও তোমরা,' বলল ওমর।

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'খাবার পানি লাগবে না? দ্বীপে যেতেই হচ্ছে। কয়েকটা নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে আসি। বেশি দেরি করব না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ব।'

বোঝা কমে গিয়ে একেবারে হালকা হয়ে গেছে ডিঙি। নাক ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলল ওমর।

পাঁচ

ফিরে এসে ডিঙিটা ঘাটে শক্ত করে বাঁধল ওমর। চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যেরা, অবাক হয়ে দেখছে সবকিছু। হুড়াহুড়ি করছে, চেঁচামেচি করছে উত্তেজনায়, কিন্তু বাধা দিল না ওমর। ছেলেমানুষ ওরা, করবেই। এমন এক জায়গা, তার নিজেরই জানি কেমন লাগছে। বলে বোঝানো যাবে না, এমনি এক ধরনের উত্তেজনা, রোমাঞ্চ।

'ওমরভাই, এ-জায়গার খোঁজ পেলেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'খুঁজে বের করিনি,' বলল ওমর। 'বাঁচার জন্যে উঠেছি। দেখি এই কাণ্ড। প্রথমে ভেবেছিলাম পাথরের স্তূপ, কিংবা উপদ্বীপ। বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে উঠলাম। বেয়ে বেয়ে উঠে এলাম এই চত্বরে। সিঁড়িটিড়িগুলো পরে আবিষ্কার করেছি।'

'কিন্তু ওই পোশাক পেলেন কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'নিচে,' সিঁড়ির দিকে আঙুল তুলে বলল ওমর। 'বেশ বড় একটা ঘর আছে।'

'আরও কাপড় আছে?'

'এক গাদা।'

'ওই সিঁড়ি দিয়েই নামা যাবে তো? মাঝে কোন বাধা-টাধা?'

'কিচ্ছু নেই, একেবারে পরিষ্কার। তবে অন্ধকার।'

আর শোনার অপেক্ষা করল না কিশোর। মুসা আর ববকে ডাকল, 'চলো, দেখি।'

হৈ-হৈ করে ছুটে গেল ওরা সিঁড়ির দিকে। সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল ওমর, চূড়ায় উঠতে শুরু করল। এটাকে পাহাড়ের চূড়া বলা যায়, নিচের ঘরটার ছাতও বলা চলে। ছাত বললেই বেশি মানানসই হবে, ভাবল সে।

চূড়া কিংবা ছাত যা-ই হোক, চমৎকার জায়গা। চ্যাপ্টা। ওপরে উঠে চারদিকে চোখ রাখতে এর জুড়ি আশেপাশে আর একটিও নেই। বাইরের শত্রু যেদিক দিয়েই আসুক, এখানে বসে কেউ চোখ রাখলে, তার চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ল্যাগুনের ধারে বালিয়াড়ি। মাটিতে পড়ে থাকা কালো একটা কিছুর ওপর ঝুঁকে রয়েছে হ্যামার আর ইমেট চাব, বোধহয় নিগ্রোটা। হঠাৎ নিচ থেকে চেঁচামেচি শোনা গেল। ছেলেগুলোকে থামানো দরকার, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ওমর। 'কি ব্যাপার?'

'এটা দেখেননি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। হাত তুলে দেখাল আরেক ধাপ সিঁড়ি, মেঝে থেকে নিচে নেমে গেছে। কতগুলো কাপড় আর কম্বল সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা চ্যাপ্টা পাথর, মাঝখানে লোহার রিঙ লাগানো। সিঁড়ির মুখ ঢাকা ছিল

পাথরটা দিয়ে।

'না, তখন ভালমত খুঁজে দেখিনি,' বলল ওমর। 'তবে ওরকম কিছুর খোঁজেই নেমেছিলাম। কম্বলে ঢাকা ছিল, না?'

'হ্যাঁ,' মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা কয়েকটা কম্বল আর কাপড় দেখাল কিশোর, 'ওগুলো ছিল ওপরে।'

'ওরকম কিছুর খোঁজে ছিলেন মানে?' প্রশ্ন করল মুসা। 'জানতেন, আছে ওটা?'

'না থাকলেই বরং অবাক হতাম।'

'কি এমন জিনিস...'

'পানি রাখার ট্যাংক। ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ে জমা হয় ওখানে। পাথর ছাড়া কিছু নেই, এখানে যারা থাকত, পানি পেত কোথায়? মূল দ্বীপে হয়তো কোথাও আছে পানি, ঝর্নাও থাকতে পারে। কিন্তু এই দুর্গে যাদের বাস ছিল, তাদেরকে যদি পানির জন্যে বাইরে যেতে হত, নিরাপত্তা থাকত? ছাতে কোথাও না কোথাও একটা গর্ত নিশ্চয় আছে, বৃষ্টির পানি ওই গর্ত দিয়ে সুড়ঙ্গপথে এসে জমা হয় ট্যাংকে। তো, পানি আছে ট্যাংকটায়?'

'দেখিনি এখনও,' বলল কিশোর।

একটা গুলি তুলে নিয়ে গর্তের মুখ দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিল ওমর।

পানিতে পড়ে টুলুপ্ শব্দ তুলল ওটা।

'হুঁ, আছে,' মাথা নাড়ল ওমর। 'খাওয়ার যোগ্য কিনা দেখি।...ওই যে, একটা বালতি,' পুরানো কাপড়-চোপড়ের মাঝে পড়ে থাকা কালো একটা জিনিস দেখাল সে। চামড়ার তৈরি, বারুদ রাখার বোতলের মতই কঠিন হয়ে গেছে এখন।

বালতি তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল কিশোর। উঠে এল পানি ভরে নিয়ে। চামড়ার বালতির জায়গায় জায়গায় ফুটো, সেগুলো দিয়ে ফোয়ারার মত পানি ছিটকে পড়ছে।

দু'হাত এক করে একটা ফোয়ারার সামনে পাতল ওমর, অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখে তুলল। 'ঠিকই আছে মনে হয়,' মাথা দোলাল সে। 'কিন্তু যতক্ষণ নারকেল আছে, আমি ওই পানি গিলছি না। মুসা, ঢাকনাটা দিয়ে রাখো। পেট জ্বলছে, আমি খাবার আনতে যাচ্ছি।'

ট্যাংকের দিক থেকে ফিরল ওমর, এই প্রথম খেয়াল করল যেন ছেলেদের পরনের বিচিত্র পোশাক।

পোকায় কাটা লাল একটা শার্ট গায়ে দিয়েছে কিশোর, পরনে পাজামা, হাঁটুর নিচে নেমেই শেষ, খুব টাইট-ফিটিং। মাথায় বিচিত্র টুপি, চূড়াটা অনেকটা চিমনির মত, ষোলো-সতেরোশো শতকে যেমন পরত নাবিকেরা। নীল-শাদা ডোরাকাটা শার্ট গায়ে দিয়েছে মুসা। শার্টের বুকের কাছে ছোট গোল একটা ছিদ্র, ছিদ্রের চারদিক ঘিরে খয়েরী একটা দাগ, বোঝাই যাচ্ছে কিসের। পরনে সুতি কাপড়ের ময়লা প্যান্ট। মাথায় দিয়েছে তিন কোণা একটা কালো টুপি। কিশোরের গায়ে শার্ট ঠিকমত লাগেনি, বড় হয়েছে, কিন্তু ববের একেবারে ঢলঢল করছে। রঙচটা নীল সিল্কের শার্ট গায়ে দিয়েছে, পুরানো একটা বেল্ট লাগিয়েছে কোমরে, শার্টের ওপরে,

ফলে মেয়েদের ফ্রকের মত লাগছে দেখতে। বেল্টের ভেতরে আবার বিরাট পিস্তল গুঁজেছে একটা। মাথায় লাল টুপি, কানের অর্ধেক ঢেকে দিয়েছে, পেছনে লেজ নেমেছে ঘাড়ের ওপর।

'হা-হাহ্!' ববকে দেখতে দেখতে হেসে ফেলল ওমর, চেহারায় ফোটাল কৃত্রিম আতংক। 'আরে, ইসরায়েল হ্যাণ্ডস দেখছি! এখন একটা জলি রোজার পেলেই হত। চূড়ায় উঁচিয়ে দিয়ে বুক চাপড়ে খাড়া হয়ে যেতাম। ভয়ংকর একদল জলদস্যু, দুর্গ দখল করে বসেছি।'

হেসে উঠল সবাই।

'স্টিভেনসনের লেখা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের ডাকাত না ইসরায়েল হ্যাণ্ডস?' বলল বব। 'পড়েছিলাম।'

'নামটা ধার নিয়েছেন স্টিভেনসন,' বলল কিশোর। 'আসল ইসরায়েল হ্যাণ্ডসও ডাকাত ছিল, খুনে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড টীচ-এর কোয়ার্টারমাস্টার।'

'এডওয়ার্ড টীচটা কে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জলদস্যু ব্ল্যাকবীয়ার্ডের নাম শুনেছ?'

মাথা ঝোঁকাল মুসা।

'এডওয়ার্ড টীচের ডাক নাম ছিল ব্ল্যাকবীয়ার্ড। এতবড় খুনী লুই ডেকেইনিও ছিল কিনা সন্দেহ।'

'লুই ডেকেইনির নাম শুনেছি,' বলল বব। 'আচ্ছা, কিভাবে মরেছিল ডাকাতটা, বলতে পারো? ফাঁসিতে? ফাঁসি দিয়ে নিশ্চয় ফাঁসিকাঠেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল লাশটা, শুকিয়ে শুকিয়ে শেষ না হওয়াতক?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওর মৃত্যুটা একটা রহস্য। কেউ জানে না, কিভাবে মারা গেছে লুই ডেকেইনি। শোনা যায়, মস্ত একটা গ্যালিয়ন দখল করার পর রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে যায় ডেকেইনি আর তার কিছু নাবিক। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল ওয়েস্ট ইনডিয়ান রুটের সদাগরী জাহাজের নাবিকেরা। আমার মনে হয়, ডুবে মরেছে ডেকেইনি আর তার দল। আমরা যে পোশাক পরে আছি, ডেকেইনির নাবিকদেরই কিনা, কে বলবে!'

'চুপ, চুপ!' আঙুল নাড়ল মুসা। 'ওসব কথা বলো না, আমার ভয় লাগে!' পরনের কাপড়গুলোর দিকে অস্বস্তিভরে তাকাল সে।

'একটা কথা কিন্তু ঠিক,' বলল কিশোর। 'রত্নদ্বীপে জলদস্যুর পোশাকে বেমানান নই আমরা।'

'রত্নদ্বীপ কি করে হলো?' ভুরু নাচাল মুসা।

'নাহলে এসেছি কেন আমরা? হ্যামারই বা পিছু নিয়ে এসেছে কেন! রত্নের লোভেই তো।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল ওমর, 'রত্নদ্বীপেই এসেছি আমরা। বরং, নামটা একটু বদলে জলদস্যুর দ্বীপ রাখলে আরও মানানসই হয়। বব যখন বলল, উভচরটা নিয়ে এখানে নেমেছে হ্যামারের দল, তখনই বুঝে নিয়েছি, এই দ্বীপেই আসতে চেয়েছিলাম আমরা।'

'ওমরভাই,' হাত বাড়াল কিশোর, 'হ্যামারের পকেট থেকে যে ম্যাপটা নিয়েছেন তাতে কিছু কিছু জায়গা বদলে দিয়েছি বটে, কিন্তু কিছু মিল আছে। আছে পকেটে? দিন তো।'

পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে দিল ওমর। 'কেন জানি মনে হচ্ছিল কাজে লাগতেও পারে, ঠিকই লাগল।'

ভাঁজ খুলে ম্যাপটা মেঝেতে বিছাল কিশোর। 'ববের বাবার নির্দেশ মত,' বলল সে, 'এই যে এখান থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে থাকার কথা জাহাজটা। আমি আরও সরিয়ে দিয়েছি। উপদ্বীপ থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে, উপদ্বীপ একটাই আছে, আর সেটাতেই রয়েছি আমরা। মূল ম্যাপে এই যে, এখানটাতে ছিল ক্রস চিহ্ন,' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। 'খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? এসেছি মোহর খুঁজতে, খোঁজা দরকার।'

'যদি হ্যামার আর ইমেট চাব কাছাকাছি থাকে?' মুসার প্রশ্ন।

'তাহলে যাওয়া যাবে না।'

'দূর, যাই আর না যাই, খেয়ে তো নিই। আর থাকতে পারছি না। ওমরভাই, টিন?'

'হ্যাঁ, চলো, নিয়ে আসি।'

'এখানে আনার কি দরকার? চত্বরে বসেই তো খেতে পারি।'

'না, ওখানে সাংঘাতিক রোদ। তাছাড়া ওখানে থাকলে ডাকাতদের চোখে পড়ে যেতে পারি। আমরা কোথায় আছি, ওদের না জানানোই ভাল।'

দুপদাপ করে ওপরে উঠে এল ছেলেরা, পেছনে ওমর। নৌকায় করে আনা সমস্ত মালপত্র হাতে হাতে নামিয়ে আনল ওরা ঘরে, ওমরের আনা নারকেলগুলোও আনল। কোন আসবাব নেই ঘরে, বসার কিছু নেই, মেঝেতেই বসল ওরা। কোথায় বসবে, কোথায় শো'বে এ-নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না।

'ওই ভদ্রলোকদের সামনে খাই কি করে? কেমন চেয়ে আছে দেখেছেন?' কঙ্কালদুটো দেখিয়ে বলল মুসা, কণ্ঠে অস্বস্তি।

'তোমারও দেখছি ভূতের ভয় আছে,' হেসে বলল ওমর, 'ববের একা না। ওরা চেয়ে আছে তো কি হয়েছে? কঙ্কাল তো কঙ্কালই, তোমার ভেতরেও তো আছে একটা।'

খেতে খেতে আলোচনা চলল। কে কিভাবে দ্বীপে নেমেছে, সেই কাহিনী খুলে বলল। মুসা আর কিশোর ভাগাভাগি করে শোনাল তাদের কাহিনী। ববঁ শোনাল তার কিসসা, কিভাবে ম্যাবরি তার গলা কাটতে যাচ্ছিল, কিভাবে ওমরভাই বাঁচিয়েছে, তার বিশদ বর্ণনা। দ্রুত কাটছে সময়। দুপুর হয়ে এসেছে।

নারকেলের মালাগুলো সযত্নে সরিয়ে রাখল ওমর, কাপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। 'বেশ বেকায়দা অবস্থায়ই পড়েছি,' চিন্তিতকণ্ঠে বলল সে। 'এই দ্বীপ থেকে যেতে পারছি না আমরা, হ্যামারও পারছে না, অন্তত সিডনি বারডু যতক্ষণ না আসছে। কিন্তু প্লেন নিয়ে গেল কোথায় ব্যাটা? ফিরছে না কেন? প্রথমে ভেবেছিলাম, হ্যামারকে আটকে ফেলেছি দেখে প্লেন নিয়ে পালিয়েছে, ফিরে আসবে

আমরা সরে গেলেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে কি করত? প্লেন নিয়ে কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করত। কিন্তু তা না করে সোজা উড়ে চলে গেল। ম্যারাকিনায়ই গেছে কিনা কে জানে। ভাবনার কথা।'

'ঠিকই বলেছেন,' মাথা কাত করল কিশোর। 'আমিও সেকথাই ভাবছি।'

'গেছে হয়তো খাবার-দাবার আনতে,' মুসা বলল। 'ওদের সব কিছু তো নিয়ে এসেছি আমরা।'

'কি করে জানল খাবার নিয়ে নিচ্ছি আমরা?' ওমরের প্রশ্ন।

চুপ করে রইল মুসা, জবাব দিতে পারল না।

'আমাদেরগুলো নিয়েছিল তো,' বব বলল, 'হয়তো ভেবেছে, এত অল্প খাবারে চলবে না। তাই আরও আনতে পাঠাচ্ছিল বারডুকে। সে রওনা দেয়ার আগেই আমরা গিয়ে হাজির হয়েছি।'

'কিংবা হতে পারে, যন্ত্রপাতি আনতে গেছে। শাবল, কোদাল, ঝুড়ি, ইত্যাদি। মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন তোলার জন্যে,' বলল মুসা।

'ওসব কিছুই আনতে যায়নি,' হাত নাড়ল কিশোর। 'ওরা ভালমতই জানে, গুপ্তধন রয়েছে জাহাজে, মাটির নিচে নয়। শাবল-কোদালের দরকার নেই, এটা আমরা যেমন জানি, ওরাও জানে। গেছে অন্য কোন কারণে।'

'তোমার কি মনে হয়?' মুসা প্রশ্ন করল। 'ভয় পেয়ে পালিয়েছে?'

'কিসের ভয়?' ওমর বলল। 'ওর মত লোক ভয় পাবে? যখন জানে হাতের কাছেই কোথাও রয়েছে একগাদা মোহর? ওসব না, অন্য কোন সিরিয়াস ব্যাপার। সে যা-ই হোক; ও যদি আর ফিরে না আসে, তো আমাদের অবস্থা কাহিল। ভালমতই আটকা পড়লাম এখানে। টিনের খাবারে আর কদ্দিন চলবে। তারপর থেকে শুধু নারকেল ভরসা। তিনবেলা নারকেল খাওয়া সম্ভব? দ্বীপে যাওয়ারও অনেক বিপদ। ওখানে হ্যামার আছে, ইমেট চাব আছে, দেখামাত্র গুলি করবে। যা খাবার আছে, আমার ধারণা, আর দুই কি তিন দিন চলবে। তারপর?'

'হ্যামার কোম্পানিরও তো একই সমস্যা,' বলল মুসা।

'কিন্তু ওদের চেয়ে আমরা খারাপ অবস্থায় রয়েছি। ঠাণ্ডা মাথায় দেখামাত্র গুলি করতে পারব না আমরা, কিন্তু ওরা দ্বিধা করবে না।'

'যাক, অন্তত একটা শয়তান মরেছে, এ-ও কম না, বলল বব।

'মরল আর কোথায়?' হাত নাড়ল ওমর। 'ভেবেছিলাম মরেছে, আসলে মরেনি। তবে গুরুতর জখম হয়েছে, নড়াচড়া বিশেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না। চলো, ওপরে যাই, দেখি ব্যাটারা কি করছে। এখন থেকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে আমাদের, পাহারা দিতে হবে, নইলে এখানেই এসে হামলা করবে হঠাৎ এক সময়। আমরা তখন অসতর্ক থাকলেই গেছি।'

'ভালই লাগছে আমার এসব ডাকাত-ডাকাত খেলা,' হেসে বলল বব। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড পড়ার সময় কল্পনাও করিনি, গুপ্তধন খুঁজতে এসে আটকা পড়ব আমরা কোনও দ্বীপে।'

ওমরও হাসল। 'মজা লাগছে, না? ঠিকই বলেছ, ট্রেজার আইল্যাণ্ডের সঙ্গে

অনেক মিল আছে, সত্যিই। হ্যামার হলো লঙ জন সিলভার, তার সঙ্গীরা জলদস্যু, আর আমরা…' হাসি বিস্তৃত হলো তার, 'আমরা…হ্যাঁ, বব হলো জিম হকিনস, কিশোর স্কয়ার ট্রেলনী, মুসা, ডক্টর লিভসী, আর আমি…আমি…'

'ক্যাপ্টেন স্মলেট,' চেঁচিয়ে উঠল বব।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর, নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল। তারপর ট্রেজার আইল্যাণ্ড বইয়ের সংলাপ নকল করে বলল, 'বান্দা আপনাদের খেদমতে হাজির, ভদ্রমহোদয়গণ। আপনাদের সহায়তায় লঙ জন সিলভারকে ফাঁসিতে না ঝোলাতে পারি তো আমার নাম ক্যাপ্টেন স্মলেট নয়। উঠুন, সবাই ডেকে যান, মন শক্ত রাখবেন। চলুন দেখি, শয়তানগুলো কি করছে।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। এমনিতেই সে ভাল অভিনেতা। ট্রেজার আইল্যাণ্ড ছবিতে দেখা স্কয়ার ট্রেলনীর ভঙ্গি হুবহু নকল করে বলল, 'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন, আরেকবার আপনার বিচক্ষণতার প্রশংসা করছি। মোহরগুলো পাওয়ার আশায় রইলাম।'

জোরে হেসে উঠল দর্শকরা।

সারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা ওপরে, ছাতে উঠল। ল্যাগুনের ধারে সৈকতে এখনও পড়ে রয়েছে ম্যাবরি। ওর পাশে বসে আছে হ্যামার আর ইমেট চাব।

'অতো সোজা হয়ে দাঁড়িও না, নিচু হও,' সাবধান করল ওমর, 'ওরা দেখে ফেলবে।'

'তীরে যাব?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বব।

মাথা ঝোঁকাল ওমর। 'হ্যাঁ, আশা করছি এখন নিরাপদেই যেতে পারব। ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে ঘুরে দেখে এলে মন্দ হয় না।'

'যদি ওরা টের পেয়ে যায়?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'যদি আক্রমণ করে?'

'আমরাও প্রতিহত করব। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েই যাব। কিন্তু খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে আমাদের অস্ত্র, পুরানো জিনিস, ওগুলোর বিশ্বাস নেই। নিজেরাই জখম হয়ে যেতে পারি। বব, তোমার পিস্তলে গুলি আছে?'

'না।'

'ঠিক আছে, চলো, নিচে। কি করে গুলি ভরতে হয়, দেখিয়ে দেব। কিশোর, মুসা, তোমরা একটা করে মাসকেট নেবে।'

আবার নিচে নেমে এল ওরা। যার যার অস্ত্র পছন্দ করে নিল। সব গাদা-বন্দুক, গাদা-পিস্তল, কি করে গুলি ভরে গুলি করতে হয়, শিখিয়ে দিল ওমর। তারপর আবার বেরিয়ে এল চত্বরে। চট করে আরেকবার ছাতে উঠে দেখে নিল ওমর, শত্রুরা কি করছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে নৌকায় চড়ল সবাই। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল দ্বীপের ঢোখা প্রান্তে। নামল। ডিঙিটা টেনে তুলে রাখল পানি থেকে দূরে, বড় একটা পাথরের খাঁজে। হ্যামার বা তার দলের কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চিত হয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে রওনা হলো ওরা। একটা টিলার মাথায় উঠে সামনে কি আছে

না আছে দেখল ওমর। ঘন জঙ্গল, ঝোপঝাড়, লিয়ানা লতা, বড় বড় ক্যাকটাস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। অন্যেরাও উঠে এল তার পাশে।

মাথা নাড়ল ওমর। 'না, ওখানে গ্যালিয়নটা আছে বলে মনে হয় না। না কি বলো?'

'ওরকম জায়গায় থাকার কথাও না,' কিশোর বলল, 'ভুল জায়গায় খুঁজছেন। আর যদি সত্যি সত্যি থেকে থাকে, তো ওটা থেকে মোহর বের করে আনা আমাদের কর্ম নয়। দেখেছেন কি ঘন জঙ্গল! আমি লাগালেও ওই জঙ্গল পরিষ্কার করতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে।'

'তবু চলো, খুঁজে দেখি,' ওমর বলল। 'ববের বাবা তো লিখেছেনই এমন জায়গায় রয়েছে জাহাজটা, যেখানে আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ঘন জঙ্গলেই তো ওটা লুকিয়ে থাকা স্বাভাবিক, মাস্তুল দেখা যাবে না, কিছুই দেখা যাবে না। খুঁজে বের করা খুবই কঠিন হবে, মনে হচ্ছে।'

দুটো ঘণ্টা পুরোদমে খুঁজল ওরা। জঙ্গলের যেখানেই সামান্যতম ফাঁক ফোকর দেখল, ঘন লতা পাতা গাছগাছালিতে সামান্যতম ফাঁক দেখল, সেখানেই ঢুঁ মারল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা উঁচু টিলায় উঠল, শুকনো খাঁড়িতে নামল। কিন্তু জাহাজের চিহ্নও চোখে পড়ল না।

আরও ঘন জঙ্গলে ঢোকার চেষ্টা করল ওরা, বিফল হয়ে বাদ দিল সে চেষ্টা। ঝোপঝাড়ে ঢাকা নিচু একটা জায়গা পেরিয়ে উঠল পাহাড়ে, সেই জায়গাটায়, যেখানে ম্যাবরির তাড়া খেয়ে উঠেছিল বব।

পাথরের ওপর বসে পড়ে শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ওমর।

'দূর! কি কষ্টরে বাবা! এমন জানলে কে আসে?' বিরক্তি প্রকাশ করল মুসা।

'কষ্টের কি দেখেছ?' বলল ওমর। 'আমার তো মনে হয়, মাত্র শুরু হয়েছে।'

'চুলোয় যাক মোহর। চলুন, ওসব খোঁজা বাদ দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

'যাবে কিভাবে?' হাসল কিশোর।

'সে তুমি জানো!' চটে উঠল মুসা। 'তুমিই তো ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এসেছ। তোমার জন্যেই তো...'

'আরে কি ঝগড়া শুরু করে দিলে ছেলেমানুষের মত?' মৃদু ধমক দিল ওমর। 'থামো। আলো আর বেশিক্ষণ নেই, সে খেয়াল আছে? ঘরে নারকেলও আছে আর মাত্র দু'তিনটে। চলো, কিছু নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে যাই। শুকনো সরু গলা দিয়ে নামাতে সুবিধে হবে।'

'হ্যাঁ, নারকেল জমিয়ে রাখা উচিত আমাদের,' কিশোর বলল।

'বব,' ওমর নির্দেশ দিল, 'যাও তো, চট করে ওদিকটা দেখে এসো। হ্যামার আর ইমেট চাব না আবার এদিকে এসে পড়ে। দেখো, সৈকতে কেউ আছে কিনা।'

দৌড়ে গেল বব।

মুসা আর কিশোর চলল একটা নারকেল কুঞ্জের দিকে, নারকেল কুড়াতে। খুব বেশি দূরে না কুঞ্জটা, কাছেই, জঙ্গলের ধারে গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু বারো কদম

যাওয়ার আগেই থেমে গেল ওরা, পড়িমড়ি করে ছুটে আসছে বব। উত্তেজিত চেহারা।

'হুঁশিয়ার!' চাপা গলায় বলল বব। 'হ্যামার আর চাব এদিকেই আসছে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর। 'কোথায়? কদ্দূর?'

'ওই যে, পাথরের স্তূপটার ওধারে। এখান থেকে ঢিল মারলে গিয়ে মাথায় পড়বে। ঝোপের ধারে ঝুঁকে কি জানি খুঁজছে।'

'মরুক হারামজাদারা!' নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসল ওমর। 'এখান দিয়ে আর যেতে পারব না, গেলেই দেখে ফেলবে। দুর্গে ফেরাই তো এক মহাসমস্যা হয়ে গেল।' মুসা আর কিশোর ফিরে এসেছে, ওদের দিকে চেয়ে উল্টোদিকে হাত তুলে বলল, 'চলো, দেখি ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় কিনা। নৌকার কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব। ওরা একটু সরলেই ভাগব।'

আগে আগে চলল ওমর, পেছনে সারি দিয়ে অন্যেরা। প্রায় ছুটে ঢুকল জঙ্গলে। একটা জায়গায় কাঁটাঝোপ আর লিয়ানা সামান্য পাতলা। নাকি পথ করা হয়েছিল কোন এক সময়, আবার লতা আর ঝোপ জন্মে ঘন হয়ে আসছে? কে পথ করল? ওরা জানে না, কয়েক মাস আগে হ্যামারের তাড়া খেয়ে এখান দিয়েই ঢুকেছিল ববের বাবা, লুকিয়েছিল এদিককার জঙ্গলেই, পথটা তৈরি করেছিল তখন।

জঙ্গলের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে কিসে হোঁচট খেল ওমর। গাছের মত লম্বা কিছু একটা, শেওলায় ঢাকা, পথ জুড়ে আড়াআড়ি পড়ে রয়েছে।

'আরে, কি এটা?' আপনমনেই বিড়বিড় করল ওমর। ঝুঁকে পরীক্ষা করল। খানিকটা জায়গার শেওলা সরিয়ে দেখেই সন্দেহ হলো। আরও অনেকখানি জায়গার শেওলা পরিষ্কার করল। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ বলে তো মনে হচ্ছে না। মানুষের তৈরি না-তো?

মানুষের তৈরিই, জাহাজের মাস্তুল, নিশ্চয় গ্যালিয়নের প্রধান মাস্তুল। ফিরে চাইল ওমর। তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, চোখাচোখি হতেই মাথা ঝোঁকাল। সে-ও বুঝতে পেরেছে। এগিয়ে আসতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটল কিশোরের। উহ্ করে নিচু হয়ে কাঁটা খুলতে গিয়ে ভারসাম্য হারাল, থাবা দিয়ে ওমরের কাঁধ ধরে ফেলল। তৈরি ছিল না ওমর, সে-ও ভারসাম্য হারাল। পড়ে যেতে শুরু করল সে-ও। একটা লতা ধরল। কিন্তু দু'জন মানুষের ভার রাখতে পারল না সে লতা, ছিঁড়ে গেল। পড়ে গেল দু'জনেই। তাদেরকে সাহায্য করতে লাফিয়ে এল মুসা আর বব।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল এই সময়। তীক্ষ্ণ চড়াৎ শব্দে ফেটে যেতে শুরু করল যেন তলার মাটি।

'আরে আরে, মাটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠল ওমর। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। কিছু বলার জন্যে আবার মুখ খুলল, কিন্তু বলা আর হলো না। তার আগেই ভেঙে গেল নিচের তক্তা, গ্যালিয়নের শেওলায় ঢাকা ডেকের কাঠ। ভাঙা গর্ত দিয়ে নিচে পড়ল ওমর।

বাকি তিনজনের ভারে তক্তা মড়মড় করে ভেঙে গিয়ে গর্ত আরও বড় হলো,

পড়ল তারাও, আট-দশ ফুট নিচের কাঠের মেঝেতে। ওমরের ওপর পড়ল কিশোর, তাই ব্যথা বিশেষ পেল না। উহ্-আহ্ করে উঠল অন্যেরা।

মুসা চেঁচিয়ে উঠল, 'গেছিরে আল্লাহ, মারা গেছি!'

সকলের আগে উঠে দাঁড়াল ওমর। হাঁপাচ্ছে? 'হলো কি? কাণ্ডটা কি হলো?' দ্রুত তাকাল চারপাশে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান করেছিল, দেখে আরও নিশ্চিত হলো এখন।

গোঁ-গাঁ করে, আরও নানারকম বিচিত্র শব্দ তুলে কোকাতে কোকাতে উঠে দাঁড়াল অন্য তিনজন। কোমর ধরে বাঁকা হয়ে আল্লাহকে ডাকছে মুসা, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে বব। কিশোর কিছুই বলছে না। উঠে ওমরের মতই তাকিয়ে দেখছে চার পাশে।

'কোথায় এলাম রে বাবা! উফ্, কোমরটা বুঝি ভেঙেই গেল! বলি এলাম কোথায়? জবাব নেই কেন? এই কিশোর...,' কনুই দিয়ে খোঁচা মারল মুসা গোয়েন্দা প্রধানের পিঠে।

'যা খুঁজছিলাম আমরা,' জবাব দিল ওমর। হাত দিয়ে ঝেড়ে কাপড় থেকে শেওলা আর ময়লা পরিষ্কার করছে। 'জাহাজটার ভেতরেই পড়েছি...শশ্শ্!' হঠাৎ থেমে গেল সে, কান পাতল।

কথা শোনা যাচ্ছে, খুব কাছে। হ্যামার। স্পষ্ট শোনা গেল এখন তার কথা। 'আমি বলছি, শুনেছি শব্দ। এদিকেই কোথাও। মিনিটখানেক আগেও ছিল।'

ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় সবাইকে চুপ থাকার নির্দেশ দিল ওমর।

নিচু হয়ে আস্তে করে মাসকেট তুলে নিল কিশোর, তার সঙ্গেই পড়েছে বন্দুকটা। মুসারটাও পড়েছে, কিশোরের দেখাদেখি সে-ও তুলে নিল। তাকাল ওপর দিকে। ডেকের ভাঙা জায়গায় ফোকর হয়ে আছে, তবে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না ফাঁকটা, লতাপাতায় ঢেকে দিয়েছে, সবজেটে আলো আসছে ওখান দিয়ে।

'হবে শুয়োর-টুয়োর কিংবা অন্য জানোয়ার,' জোরাল গলা শোনা গেল ইমেট চাবের।

'আমি বলছি কথা শুনেছি!' হ্যামার বলল।

'তাহলে আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চলো, সরে যাই। জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে আমাদের দেখছে কিনা কে জানে? পালের গোদাটার কাছে পিস্তল আছে। ম্যাবরির মত পিঠে গুলি খাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। চলো। যাবে কোথায় ওরা? কাল সুযোগমত ধরে ফেলব। আরে, চলো না! দেবে তো মেরে।'

নিশ্চয় দ্বিধা করছে হ্যামার, কারণ পায়ের শব্দ শোনা গেল না তক্ষুণি।

কান পেতে রয়েছে নিচের শ্রোতারা। অবশেষে ফিরল ওপরের দু'জন, ধীরে ধীরে চলে গেল, বোঝা গেল শব্দ শুনেই।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল ওমর, 'গেছে। এই সুযোগে জাহাজটায় তল্লাশী চালিয়ে দেখি আমরা। কি বলো?'

ছয়

ওমর আর তার দল জাহাজের যেখান দিয়ে পড়েছে, ববের বাবা সেখান দিয়ে পড়েনি, সে পড়েছিল স্যালুনের ছাত দিয়ে স্যালুনে। তখনকার দিনে জাহাজের স্যালুন তৈরি হত সাধারণত পূপের ওপর। ওমর আর তার তিন সঙ্গী পড়েছে জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায়।

ভেতরে কি কি আছে দেখায় মন দিল ওরা। এক জায়গায় পড়ে আছে কম্বলের স্তূপ, দীর্ঘ দিন স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থেকে ছাতা পড়ে গেছে—সবুজ ছত্রাক। ওগুলোর কাছেই পড়ে আছে কাপড়ের স্তূপ, নষ্ট হয়ে গেছে সব ছাতা পড়ে। পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। মরচে পড়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বোধহয় তাড়াহুড়ো করে যাওয়ার সময় ফেলে গিয়েছিল নাবিকেরা। মূল্যবান কিছুই নেই।

'এখানে গুপ্তধন নেই,' জোরে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে ওমর, বিষণ্ণ এই প্রাচীন পরিবেশ ভাল লাগছে না তার। মৃতের জগতে এসে হাজির হয়েছে যেন।

বেরিয়ে এল ওরা। নীরবে এগিয়ে চলল জাহাজের কোমর ধরে। পেরিয়ে এল বহু পুরানো কামান—ধুলো ময়লায় ঢাকা, কামানের গোলা, বারুদের পিপা—কয়েকটা আবার বারুদে বোঝাই, মোটা শেকল, দড়ি, গাছের গুঁড়ি, খুঁটি, এমনি সব জিনিস। ওপরে জায়গায় জায়গায় চিড় ধরেছে তক্তা, ফাটল, আবছা আলো আসছে সেসব পথে, সেই আলোয় কেমন যেন বিকট দেখাচ্ছে জিনিসগুলো, গা শিরশির করে।

'গুপ্তধন ছাড়াই অনেক মূল্য জাহাজটার,' বলল কিশোর, 'অ্যানটিক মূল্য। যে কোনো যাদুঘর পেলে লুফে নেবে। এত পুরানো জাহাজ এত সংরক্ষিত অবস্থায় আর পাওয়া যায়নি। যাদুঘরে রাখলে দলে দলে আসবে দর্শক শুধু এটা দেখার জন্যেই। আমি শুনলে আমিও যেতাম। গুপ্তধন যদি না-ও পাই, বাড়ি ফিরে এই জাহাজের খবর দিলেই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাব।'

সাবধানে, খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা দেখতে দেখতে, যেন যাদুঘরে রয়েছে, কোনো কিছুতে পা পড়লে কিংবা হাত দিলে যেন এখুনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে প্রহরী।

পাথরের এক বিশাল বয়েম দেখাল ওমর, বোতলের গলাটা খুব সরু, মুখে পাথরের ছিপি আঁটা। গায়ে কালো কালিতে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছেঃ বেস্ট ওল্ড জ্যামাইকা। বোতলটার দিকে চেয়ে, ট্রেজার আইল্যাণ্ডে জলদস্যুদের গাওয়া সেই বিখ্যাত চরণটি সুর করে গেয়ে উঠল ওমর, 'ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল্ অভ রাম।' ভারি পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করল সে।

নিশ্চয় ভেতরে রয়েছে অনেক পুরানো মদ। বোতলটার দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে ওটা থেকে নিয়ে খেলে পরের চরণটাও সত্যি হয়ে যাবে ঃ ড্রিংক অ্যাণ্ড ডেভিল হ্যাভ ডান ফর দা রেস্ট।'

ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ির গোঁড়ায় এসে থামল ওরা। ভালমত পরীক্ষা করে

দেখল, ভার সইতে পারবে কিনা, তারপর পা দিল ওতে। বড় একটা ঘরে এসে ঢুকল। এটা ক্যাপ্টেনের স্যালুন।

ছাতের প্রায় গোল একটা ফোকর দিয়ে আলো আসছে। ঠিক নিচেই জমে রয়েছে শুকনো পাতা, কুটো, ছেঁড়া শুকনো লতা আর শেওলা। আঙুল তুলে ফোকরটা দেখিয়ে বলল কিশোর, 'ওখান দিয়েই পড়েছিলেন ববের বাবা।'

ববের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করে বলল ওমর, 'দেখো, দেখো!' মাথা নাড়ছে আস্তে আস্তে, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

অন্যেরাও দেখল, নাড়া খেলো ওমরের মতই।

প্রচুর টাকা খরচ করে সাজানো হয়েছিল স্যালুনটা। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় লাগানো রয়েছে সোনালি রঙের সুদৃশ প্রদীপদানী, তার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম ছবি, সবই সাধুদের কিংবা ধর্মীয় কোনো পবিত্র দৃশ্যের। অপরূপ কার্পেটে ঢাকা পুরো মেঝে, আর কি তার রঙ। উজ্জ্বল লাল আর নীলের মাঝে সোনালি আলপনা। দেয়ালের সঙ্গে লোহার চ্যাপ্টা দণ্ড দিয়ে আটকানো রয়েছে বড় বড় আলমারি, ঢেউয়ের দোলায় বা ঝড়ের ঝাঁকুনিতে যাতে স্থানচ্যুত না হতে পারে, সে-জন্যে। আলমারির আঙটায় ঝুলছে বড় বড় তালা, বেশির ভাগই খোলা। সামনের দিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে ওয়ালনাট কাঠের মস্ত এক টেবিল, তাতে চমৎকার খোদাইয়ের কাজ। কিন্তু এসব দেখে নাড়া খায়নি দর্শকরা। তাদের চমকে দিয়েছে একটা কঙ্কাল। উঁচু পিঠওয়ালা, জায়গায় জায়গায় তামার কাজ করা একটা ভারি চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে রয়েছে কঙ্কালটা।

'খাইছে!' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। 'জ্যান্ত মনে হচ্ছে!' তার ভয়, এখুনি বুঝি, 'হ্যাল্লো, কেমন আছ,' বলে হাত মেলাতে উঠে আসবে পোশাক পরা কঙ্কালটা।

আস্তে আস্তে কঙ্কালটার কাছে এগিয়ে গেল ওমর। ফেকাসে হয়ে গেছে চেহারা। বিকট ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে আছে যেন কঙ্কাল, কালো অক্ষিকোটর আরও ভয়ংকর করে তুলেছে চেহারাকে, দীর্ঘ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল ওমর, পরনের কাপড়-চোপড়গুলো দেখল।

ওমরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। ভালোমত দেখে বলল, 'জাহাজটা স্প্যানিশ, সন্দেহ নেই,' খুব আস্তেই বলছে সে, কিন্তু অস্বাভাবিক এই নীরবতায় অনেক জোরালো হয়ে কথাটা কানে বাজল যেন, 'কিন্তু এই লোকটা স্প্যানিয়ার্ড ছিল না। পোশাক দেখেছেন? জলদস্যুর। নিশ্চয় কোনো অঘটন ঘটেছিল, ওর দলে বোধহয় ও-ই বেঁচেছিল শেষ অবধি,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে টেবিলে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিল সে। উল্টে পাল্টে দেখে ওমরের হাতে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো! পিস্তল-বন্দুকের ব্যাপারে আমি আনাড়ি।'

ভালমত নাড়াচাড়া করে দেখল পিস্তলটা ওমর, গন্ধ শুঁকল। 'গুলি নেই ভেতরে। মনে হয়···মনে হচ্ছে,' কাঁপা কাঁপা হাতে কঙ্কালটাকে চেয়ারসুদ্ধ সামান্য সরাল সে, ঘোরাল নিজের দিকে। 'দেখো, দেখো!'

সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল, ওমর কি দেখেছে দেখার জন্যে। রঙচটা

পোশাকের পেটের কাছটায় চেপে রয়েছে কঙ্কালের ডান হাতের আঙুলগুলো। গোল একটা ছিদ্র শার্টে, ছিদ্রের ধারটা পোড়া।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওমর, মেঝেতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। 'খোদা!' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে। 'এই পিস্তলের গুলিতেই মরেছে। আত্মহত্যা নয়তো? দেখো।'

দেখল সবাই। কঙ্কালটার জুতোর চারপাশ ঘিরে কার্পেটে কালচে গাঢ় দাগ, শুকনো রক্ত ছাড়া আর কোন কিছুতেই ওই দাগ হতে পারে না।

'মন খারাপ হয়ে যায়, না?' অনেকখানি সামলে নিয়েছে ওমর। আবার আগের অবস্থায় সরিয়ে রাখল কঙ্কালটাকে। সরানোর সময় টুপ করে কি যেন পড়ল মেঝেতে। কুড়িয়ে নিল ওটা, অন্যেরাও কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। 'গুলি,' বলল ওমর। 'এটাই খুন করেছিল লোকটাকে। শরীরের ভেতরেই কোথাও আটকে ছিল, নড়াচড়ায় খসে পড়েছে। সুভনির রাখতে চাও, বব?'

নাক-মুখ বাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল বব। দু'হাত নেড়ে বলল, 'না দরকার নেই।'

হেসে উঠল অন্যেরা। এতক্ষণের গুরুগম্ভীর পরিবেশ হালকা হয়ে গেল হঠাৎ করে।

পিস্তলটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল ওমর। রূপার মোমদানীটা দেখিয়ে বলল, 'কমপক্ষে দু'শো পাউণ্ড হবে এখনকার বাজারে ওটার দাম। ড্রয়ারগুলোতে কি আছে,' বলতে বলতেই টান দিয়ে টেবিলের সব চেয়ে ওপরের ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। চামড়ায় বাঁধা একটা বই তুলে নিল ড্রয়ার থেকে। আস্তে করে কভার ওল্টাল, যেন ছিঁড়ে যাবে ভয় করছে। প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়তে শুরু করল।

চেহারার ভাব বদলে যাচ্ছে ওমরের, দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে, বইয়ের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে মাথা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ, হাতের আঙুল কাঁপছে। মুখ তুলে তাকাল সে। সবাই অবাক হয়ে আছে তার দিকে। 'কি আছে এতে জানো?' খসখসে হয়ে গেছে ওমরের কণ্ঠ। 'ভয়ংকর এক খুনীর কথা, এই একটু আগে যার কথা বলেছিলাম। লুই ডেকেইনি, যার অনেকগুলো নাম, লুই লা গ্রানডি, দা এক্স্টারমিনেটর, নিজেকেই এক্স্টারমিনেট করেছে, আত্মহত্যাই করেছে বোধহয়।'

হঠাৎ করেই বড় বেশি নীরব হয়ে গেল ঘরটা। ঠিক এমনি নীরবতা বিরাজ করেছিল তিনশো বছর আগে, ডেকেইনি গুলি খাওয়ার আগের মুহূর্তে।

লম্বা দম দিল ওমর। হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, 'এটা ডেকেইনির লগবুক। দারুণ লাগবে পড়তে। নিশ্চয় লেখা আছে, কিভাবে, কখন কোন খুনটা করেছিল, কি কি করেছিল। ভাবছি, কত বীরত্বের গাথা লেখা আছে এতে? কত নিরীহ নাবিকের মৃত্যুর কাহিনী? দেখি তো, ডেকেইনি কিভাবে মারা গেছে...' দ্রুত পাতা উল্টে চলল সে। লেখা যে পৃষ্ঠায় শেষ, সেটাতে এসে থামল। পড়তে শুরু করল জোরে জোরেঃ

'...রাম শেষ, জাহাজে বিদ্রোহ চলছে, সবাই দ্বিধাগ্রস্ত। বউনের মোহরই এজন্যে দায়ী, নরকে পচে মরুক চোর হারামজাদা। বার বার এসে আমাকে চাপ

দিচ্ছে নাবিকেরা, সমস্ত মোহর সাগরে ফেলে দিতে বলছে, কিন্তু আমি কি আর রাজি হই? মোহরটা অভিশপ্ত হলে ওরাও মরবে, মরুক আগে, আমি দেখি, তারপর যা করার করব।

'বাতাস বাড়ছে আবার, পাল তোলার কেউ নেই। পাইকারী খুন, বিদ্রোহ, ঝড়, নীরবতা, পানির সমস্যা, তারপর আবার ঝড়ের সংকেত। মনে হচ্ছে, শয়তান নিজে এসে হাত লাগিয়েছে, জাহাজে বাস করছে যেন সে, সবাইকে, সব কিছুকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। হারামজাদা বউন, নিজেও মরেছে, পোর্ট রয়ালের ফাঁসিকাঠে নিশ্চয় শেকলবাঁধা অবস্থায় পচে-গলে শেষ হচ্ছে এখন, আমাদেরকেও মেরে রেখে গেছে। ওর মোহরে ভর করেই যেন এসেছে শয়তান। সবাইকে শেষ করেছে; কেউ পাগল হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, হাঙরেরা খতম করেছে তাদের, কেউ ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, বাকি রয়েছি আমি...'

চুপ হয়ে গেল ওমর।

'আর কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না।'

'ডেকেইনি এরপর কি করল, খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'জানা যাবে না কোনদিনই। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? বার বার বউনের মোহরের কথা উল্লেখ করেছে। বউনের অভিশপ্ত মোহর। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল ডেকেইনির নাবিকেরা। বউন কে জানি না, আমেরিকায় ফিরে জ্যামাইকার পুরানো রেকর্ড ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয়তো জানতে পারব। আমার ধারণা, বউনের মোহরই পড়ে ছিল এই টেবিলে...'

'বাবা যেটা তুলে নিয়েছিল,' বলে উঠল বব।

'হ্যাঁ। কুসংস্কার নেই আমার, আগেই বলেছি। কিন্তু তবু কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারছি না, মোহরটার কিছু অশুভ ক্ষমতা আছে। যেখানে যার হাতেই গেছে, তারই ক্ষতি করেছে। যতক্ষণ আমাদের কাছে ছিল, একটার পর একটা বিপদে পড়েছি। ওটা হাতছাড়া হওয়ার পর থেকেই ভাগ্য ভাল হতে শুরু করেছে। অ্যালেন কিনে নিয়েছিল ওটা, তার অবস্থা দেখেছি আমরা। তারপর আমাদের কি দুরবস্থা। ববের কপাল ভাল, জ্যাকেকটা খুলে ফেলেছিল, নইলে সে-ও মরত। আশ্চর্য, জ্যাকেটটা এত ঝড়েও ভেসে গেল না, তীরে এসে পড়ল। কিশোর আর মুসা, তোমরা পেলে ওটা, মোহরটা নেয়ার একটু পরেই কি বিপদে পড়েছ, মরতে মরতে বেঁচেছ। ম্যাবরি নিল ওটা, গুলি খেলো আমার হাতে। আমার বিশ্বাস, ওই মোহরের জন্যেই শেষ হয়ে গেছে ডেকেইনি আর তার দলবল।'

'আরও অনেক মোহরের উল্লেখ করেছে ডেকেইনি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

'বলেছে,' বলল ওমর, 'কিন্তু কেন বলেছে? কেন সব মোহর সাগরে ফেলে দিতে চাপ দিয়েছে নাবিকেরা? কারণ, তারা জানত, ওই মোহরের সঙ্গে বউনের মোহরটাও আছে। জানত না, ঠিক কোনটা বউনের অভিশপ্ত মোহর। তাই জাহাজে যত মোহর ছিল, সব ফেলে দিতে চেয়েছে।'

'শেষ অবধি কি তাহলে সব মোহর ফেলে দিয়েছিল?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন

করল কিশোর। 'নইলে গেল কোথায় ওগুলো?'

'আমার মনে হয় ফেলেনি,' ওমর বলল। 'তাহলে বউনের মোহরটা থাকত না ডেকেইনির কাছে সে নিজেও মরত না। মোহরগুলো আছে হয়তো জাহাজে, কিংবা কাছাকাছি কোথাও।'

'কিন্তু কোথায় আছে?' ভুরু নাচাল মুসা।

'সেটা বের করার জন্যেই তো এসেছি আমরা,' বলল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে সে। 'আমার মনে হয়, মোহর লুকিয়ে রেখে জায়গাটার ম্যাপ তৈরি করে ডেকেইনি, তারপরই কোনভাবে মারা যায়। তার আঁকা আসল ম্যাপটা নেই এখন আমার কাছে, তবে নকলটা আছে, আর কোন্ কোন্ জায়গা বদল করেছি, সেটাও মনে আছে আমার। দেখি রহস্য ভেদ করা যায় কিনা।' পকেট থেকে নকল ম্যাপটা বের করল সে। 'একটা কলম দরকার,' বলেই চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল পালকের কলমটা, যেটা দিয়ে লিখেছিল ডেকেইনি। ছাতের ফোকর দিয়ে বাইরে তাকাল, আলো কমে গেছে। 'বেরোনো দরকার। আর পনেরো মিনিটেই অন্ধকার হয়ে যাবে। খুব কাছাকাছি না থাকলে আজ আর খুঁজে বের করা যাবে না মোহর, সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে দেখে নিই একবার।' কলম আর ম্যাপ টেবিলে রেখে দিয়ে কাজে লেগে গেল সে।

টেবিলের বাকি ড্রয়ারগুলো খুলে দেখল কিশোর। বেশ কিছু জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে তিনটে জিনিস মনোযোগ আকর্ষণ করল। তার একটা, কালো এক টুকরো কাপড়। সুন্দরভাবে ভাঁজ করা। মনে হলো টেবিলক্লথ। ড্রয়ারটা লাগিয়ে দিল কিশোর, হঠাৎ কি মনে পড়তেই টেনে আবার খুলল। কাপড়ের এক কোণ ধরে বের করে এনে ঝাঁকি দিয়ে খুলল পুরোটা, দু'হাতে ধরে ছড়াল। কালো একটা পতাকা, মাঝখানে মানুষের খুলির তলায় মানুষের হাড়ের ক্রসচিহ্ন—শাদা কাপড় কেটে সেলাই করে লাগানো হয়েছে। একটা হাড়ের নিচে লেখা বড় হাতের 'এল', আরেকটার নিচে 'ডি'।

'ভাগ্যের কি পরিহাস,' বিড়বিড় করল ওমর। 'যে কঙ্কালের চিহ্ন উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে সে, সেই কঙ্কাল হয়ে নিজেই বসে আছে এখন চেয়ারে, তার কঙ্কালখচিত পতাকার কাছেই। মুহূর্তের জন্যেও এখন এই দৃশ্যটা যদি দেখতে পেত ডেকেইনি।'

পতাকাটা আবার ভাঁজ করে ববের দিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। 'রেখে দাও, চমৎকার ট্রফি। তুমি রাখতে না চাইলে পরে আমাকে দিয়ে দিয়ো।'

আরেক ড্রয়ারে পাওয়া গেল খুব সুন্দর একটা চুনি বসানো আঙটি।

'দেখি তো,' হাত বাড়াল ওমর। আঙটিটা নিয়ে দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

অন্য আরেক ড্রয়ারে পাওয়া গেল শ'খানেক রূপার মুদ্রা। একটা তুলে নিয়ে দেখে বলল কিশোর, 'পিসেস অভ এইট। মুসা, একটা ব্যাগ-ট্যাগ পাও নাকি দেখো তো। নিয়েই যাই এগুলো। হ্যামারের হাতে পড়লে আর ফেরত পাওয়া যাবে না। আমরা যেমন দেখেছি, ওরাও দেখে ফেলতে পারে জাহাজটা।'

এরপর সবাই মিলে খুঁজল পুরো ঘর। প্রতিটি আলমারি খুঁজে দেখল। মোহর মিলল না কোথাও। রয়েছে গাদা গাদা সিল্ক, স্যাটিন আর মিহি সুতার কাপড়, পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। জাহাজের খোলে ঢুকে, খোঁজাখুঁজি করল। মোহর পাওয়া গেল না, তবে কয়েক পিপা ছাতা পড়া চিনি, কফি আর ময়দা পেল।

অনেক জায়গা খোঁজার বাকি রয়ে গেল, থাকারও ইচ্ছে আছে ওদের। কিন্তু থেকে লাভ নেই। অন্ধকার হয়ে গেছে।

'আলো ছাড়া হবে না,' বলল ওমর।

'আলো থাকলেও রাতে থাকছি না আমি এখানে,' জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'লুই ডেকেইনির ভূত ঠিক এসে ঘাড় মটকাবে।'

মুসার বলার ধরনে হেসে ফেলল সবাই।

'এই, ওমর ভাই,' আবার বলল মুসা, 'খিদে পায়নি আপনার? চলুন না, বেরোই।'

'হ্যাঁ, চলো যাই। সকালে আবার আসব।'

কিন্তু যত সহজে বলে ফেলল, তত সহজে বেরোনো গেল না। উঠবে কিভাবে? ওমরের কাঁধে দাঁড়িয়ে ফোকরের ধার ধরে দোলা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল মুসা, তক্তা ভেঙে ধুড়ুম করে পড়ল আবার নিচে, সবার ভয় হলো, স্যালুনের মেঝে ভেঙে না খোলে পড়ে যায়। ওভাবে বেরোনোর চেষ্টা বাদ দিতে হলো। একা বেরোতে কতখানি কষ্ট হয়েছিল ববের বাবার, উপলব্ধি করল ওরা। মনে পড়ল, জাহাজের খোল কেটে বেরিয়েছিল কলিনস।

খোঁজাখুঁজি করতেই ফোকরটা পাওয়া গেল, জাহাজের সামনের গলুইয়ের নিচে। হাতে হাতে ট্রফিগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। বিষণ্ণ অতীত ছেড়ে বেরিয়ে এল যেন বর্তমান পৃথিবীর উজ্জ্বল তারাখচিত আকাশের নিচে।

যেভাবে রেখে গিয়েছিল, তেমনিই রয়েছে নৌকাটা। পানিতে নামিয়ে তাতে চড়ে বসল সবাই। ফিরে এল উপদ্বীপে।

'কাল খুব সকালে বেরোব,' যেতে যেতে বলল ওমর। নারকেলের মালায় নারকেলের পানি, শক্ত শুকনো খাবার গলায় আটকে গেলে সেই পানি দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছে। 'মোহর খোঁজার আগে এই দুর্গটাকে দুর্ভেদ্য করে নিতে হবে। প্রতিরোধ যাতে করতে পারি, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারব না এখানে, এক সময় দেখে ফেলবেই হ্যামার আর ইমোট চাব, জেনে যাবে কোথায় আছি আমরা। হয়তো বারডুও ফিরে আসবে। কি করবে তখন ব্যাটারা? আমি হলে, দ্বীপের প্রান্তে এসে পাথরের স্তূপের আড়ালে বসে থাকতাম, যাতে উপদ্বীপ থেকে কেউ বেরোতে না পারে। ওরাও যদি তাই করে? আমি হলে অবশ্য দেখামাত্র গুলি করতাম না, কিন্তু ওরা করবে।'

'কি করব আমরা কাল সকালে, বললেন না?' শুকনো মাংস চিবাতে চিবাতে বলল মুসা।

'প্রচুর নারকেল এনে জমিয়ে ফেলতে হবে। বারুদ আনতে হবে জাহাজ থেকে, লড়াই লেগে গেলে তখন অনেক বারুদের দরকার পড়বে। আর আজ রাত

থেকেই পাহারা দিতে হবে আমাদের।'

খাওয়া শেষ হলো। প্রথমে ববকে পাহারায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। দু'ঘণ্টা পর এসে মুসাকে তুলে দেবে সে। এমনি করে একজনের পর একজন পাহারা দিয়ে রাতটা পার করে দেবে।

'ম্যাপটা ভালমত দেখা দরকার,' বলল কিশোর।

'এখনই?' বলল ওমর। 'সকালে দেখলে হয় না? খামোকা মোম জ্বালিয়ে লাভ কি?'

'ভাগ্য ভাল, আমাদের জিনিস আবার ছিনিয়ে আনতে পেরেছি হ্যামারের কাছ থেকে। কিন্তু তা না হলেও কি অন্ধকারে থাকতাম? এত নারকেল থাকতে?' হাসল কিশোর। 'আলোর অভাব হবে না।' পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আলোর সামনে বিছাল সে। জাহাজ থেকে পালকের কলম, কালির দোয়াত নিয়ে এসেছে। কালি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তাতে সামান্য পানি ঢেলে নিতেই আবার কালি হয়ে গেল। পাতলা কালি, তবে কাজ চলবে।

'আরেকটা ম্যাপ এঁকে ফেলি,' বলল কিশোর। ডেকেইনির লগবুক থেকে একটা শাদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে আরেকটা ম্যাপ আঁকল। ডেকেইনির আঁকা ম্যাপটার মতই হলো অবিকল, নকলটার মত ভুল জায়গায় চিহ্ন দিল না, যতদূর সম্ভব সঠিক জায়গায় দেয়ার চেষ্টা করল। সবই আঁকল ঠিকঠাক, কিন্তু কোনটা কিসের চিহ্ন জানে না। এক দুর্বোধ্য রহস্য মনে হলো। অন্য তিন জনের দিকে চেয়ে বলল, 'কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

'তুমি বুঝেছ?' মুসা প্রশ্ন করল।

'না।'

'কিশোর পাশা যে রহস্যের মীমাংসা করতে পারেনি, আমরা তার কি কচুটা বুঝব? আমি ঘুমাতে যাচ্ছি, তুমি সমাধান করে জানিও,' উঠল মুসা, কম্বল বিছাবে।

'আরে দাঁড়াও, কাজ আছে,' হাত তুলল কিশোর।

'কি?' ঘুরে তাকাল মুসা।

'ওই দুই ভদ্রলোক,' ঘরের কোণ দেখাল কিশোর। 'ওদেরকে ঘরে রেখে ঘুমাতে অস্বস্তি লাগবে। চলো, সাগরে ফেলে দিয়ে আসি।'

'মাপ চাই, ভাই, আমি পারব না,' হাতজোড় করল মুসা।

'আরে দূর, এসো,' হাত ধরে টানল কিশোর, 'কঙ্কালই তো, ভয় কি? পাথরের যেমন প্রাণ নেই, ওগুলোরও নেই।'

কিন্তু কঙ্কাল দুটো বের করে ফেলার সময় দেখা গেল, মুসার চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না কিশোর, কম অস্বস্তি বোধ করছে না। হেঁইও হেঁইও করে কঙ্কাল দুটো পানিতে ফেলে দিল ওরা।

'বব, তুমি থাকো,' বলল ওমর। 'দু'ঘণ্টা পর এসে মুসাকে ডেকে দিয়ো।'

'কিন্তু সময় বুঝব কি করে?' প্রশ্ন তুলল বব। 'ঘড়ি কই?'

'অনুমান,' কিশোর বলল। 'ওই যে, ওদিকে নারকেল গাছগুলো দেখেছ? চাঁদ যখন গাছগুলোর মাথায় উঠবে, ধরে নেবে, দু'ঘণ্টা হয়েছে। ও হ্যাঁ, বন্দুক রেখো

সঙ্গে।'

'আই, আই, মিস্টার ট্রেলনী, স্যার,' ট্রেজার আইল্যাণ্ডের জিম হকিনসের সংলাপ ধার নিল বব। পাহারা দিতে চলল।

সাত

সময় যেন কাটতেই চাইছে না ববের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিচ থেকে কথাবার্তা শোনা গেল, কমতে কমতে থেমে গেল এক সময়। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের রাত, কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, অসহ্য নীরবতা। সামান্যতম শব্দ নেই কোথাও। পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু ছপছপ শব্দ ছিল, সেটাও থেমে গেছে। নারকেলের পাতা স্থির, তারাগুলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, এত কাছে মনে হচ্ছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আকাশ যেন মস্ত এক গম্বুজ, ওখান থেকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ তারাগুলো। দিগন্তে উঁকি দিল লালচে চাঁদ, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ওপরে, রূপালী করে দিল সাগরকে। রহস্যময় হয়ে উঠল দ্বীপটা। শাদা বালির সৈকত আর মাঝে মাঝে পাথরের স্তূপকে দেখে মনে হচ্ছে, সাগরের পানি থেকে মাথা তুলেছে কোন অজানা দানব।

অবাক হয়ে প্রকৃতির এই রূপ দেখছে আর ভাবছে বব। পাশে রাখা বন্দুকের গায়ে হাত বোলাল। ঠিক এখানটায় এমনিভাবে বন্দুক নিয়ে বসে দূর অতীতে এমনি কোন রাতে নিশ্চয় পাহারায় ছিল কোন জলদস্যু। যে দুটো কঙ্কাল ফেলে দিয়ে এসেছে খানিক আগে, তাদেরও কেউ হতে পারে। আচ্ছা, ওদেরই মত ববও তো একদিন কঙ্কালে পরিণত হবে, সেদিনও কি ঠিক এমনি থাকবে প্রকৃতি? এমনি করে চাঁদ উঠবে, জ্যোৎস্না বিলাবে, আকাশে জ্বলবে তারা? এমনিই থাকবে সব, জানে বব, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায় না। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে সে একদিন, মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে যাবে তার স্মৃতি, ভাবতেই যেন কেমন লাগে। কোন দিন মনে হয়নি, কিন্তু এই পরিবেশে আজ হঠাৎ করেই মনে হলো, জীবনের কোন অর্থ নেই। এই জন্মানো, বেঁচে থাকা, তারপর একদিন মরে যাওয়া, এর কোন মানেই নেই।

আচ্ছা, এই দুর্গে কারা ছিল? ডেকেইনির লোক? নাকি দিগ্বিজয়ী মহানাবিক ড্রেক? জানে না বব, হয়তো কেউই জানে না, জানার কোন উপায় নেই। আহা, কি রোমাঞ্চকর দিনই না কাটিয়েছে তারা! মরে গেছে ঠিক, কিন্তু উপভোগ করে গেছে জীবনটা। আফসোস হলো ববের, কেন আরও দু'তিনশো বছর আগে জন্মাল না? ড্রেকের নাবিকদলের একজন হতে বড় ইচ্ছে করে। লুই ডেকেইনির দলের কেউ হতেও আপত্তি থাকত না তার। সেই তো জন্মাল, কিন্তু এমন এক যুগে, যখন ভাত-কাপড়ের চিন্তা করতেই সময় শেষ। দুত্তোর, জন্মানোর নিকুচি করি, লাথি মারি এই বেঁচে থাকার কপালে!—বিড়বিড় করল সে। ভাগ্যিস কিশোর পাশার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে এই ক'দিনের অভিযানের স্বাদটুকুও পাওয়া হত না।

প্রচণ্ড হতাশা গ্রাস করল তাকে। কপালগুণে মোহর যদি পায়ও, বড়লোক

হয়তো হবে, খাওয়া-পরার ভাবনা হয়তো থাকবে না, কিন্তু লুই ডেকেইনির মত জলদস্যু কি আর হতে পারবে? পাবে সেই রোমাঞ্চের স্বাদ? হতে পারবে ড্রেকের মত দিগ্বিজয়ী নাবিক? পারবে না, কোনদিনই পারবে না, কারণ সেই যুগ আর নেই। চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কাঠের জাহাজে পাল তুলে অজানার উদ্দেশ্যে বোরোনোর অবকাশ আর নেই। ববের ধারণা, মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে, ইঞ্জিন আবিষ্কার করে, লোহা আর ইস্পাত দিয়ে জাহাজ তৈরি করতে শিখে। মস্ত চিমনি দিয়ে ভকভক করে বেরোয় কালো ধোঁয়া, দূর, এ কোন দৃশ্য হলো নাকি? শাদা পাল ঘিরে চক্কর দিয়ে উড়ন্ত সী-গাল, সফেদ অ্যালবেট্রস, কোথায় সেই ছবি, আর কোথায় কালো···মাঝে মাঝে গেঁউউউউ করে কান ঝালাপালা করে দিয়ে বেজে ওঠা লোহার জাহাজের বিরক্তিকর বাঁশি···বাতাসে থাবা দিয়ে বিরক্তিকর শব্দ সরানোর চেষ্টা করল যেন বব।

কিন্তু এই মুহূর্তে জীবন খুব একটা একঘেয়ে নয় ববের জন্যে, অনেকের চেয়ে সে ভাগ্যবান। দারুণ রোমাঞ্চকর এক অভিযানে এসেছে। আর সত্যিই যদি গুপ্তধন পেয়ে যায় তাহলে তো এক লাফে বড়লোক। গুপ্তধন, মোহর! শব্দ দুটো উচ্চারণ করল সে বিড়বিড় করে। কোথায় আছে ওগুলো? ম্যাপটার কথা ভাবল। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। আচ্ছা, মোহরটায় কোন সংকেত নেই তো? যেটা গর্তে ফেলে দিয়েছে ওমর ভাই? যেটাকে অভিশপ্ত ভাবা হচ্ছে?

যতই ভাবল বব, মনে হলো, উচিত হয়নি, মোটেই উচিত হয়নি ফেলে দেয়া। ভালমত দেখা দরকার ছিল। হয়তো ওতেই রয়েছে গুপ্তধনের নিশানা, আঁচড় কেটে বা অন্য কোনভাবে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে হয়তো ডেকেইনি।

মোহরটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল ববের। খুব বেশি দূরে তো নয়। নৌকা নিয়ে যাবে আর আসবে, বড় জোর মিনিট দশেক লাগবে। এটুকু সময়ে কিছু ঘটবে না, নিজেকে বোঝাল বব। পাহারা ছেড়ে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না, এটাও জানে। কিন্তু সব কিছুই এত বেশি শান্ত, অঘটন ঘটার আশংকা মনে আসতেই চাইছে না।

অবশেষে মনস্থির করে নিল সে, যাবে। পাহারা ছেড়ে যাচ্ছে বলে একটা অন্যায়বোধ পীড়া দিচ্ছে মনকে, জোর করে দমন করল সেটা। দ্রুত ছাত থেকে নেমে ঘরে ঢুকল। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শান্ত পরিবেশ। পা টিপে টিপে একধারের দেয়ালের কাছে এসে ঠেস দিয়ে রাখল রাইফেলটা, হাতড়ে বের করল তার পিস্তল, কোমরে গুঁজে বেরিয়ে এল চত্বরে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে নৌকা খুলে সাগরে ভাসাল। রওনা হলো দ্বীপের দিকে।

বিকেলে যেখান দিয়ে উঠেছিল, সেখান দিয়েই উঠল বব। পাথরের খাঁজে নৌকা রেখে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। ওপরে উঠে নিচে তাকিয়ে দেখল একবার। নির্জন, কোন সাড়াশব্দ নেই। কেন জানি মনে হলো তার, এমনি নীরবতা বিরাজ করছিল তখন গ্যালিয়নের ভেতর, লুই ডেকেইনির কঙ্কালটা দেখার পর। তার প্রেতাত্মা ঘোরাফেরা করছে না-তো? দূর, কি যা-তা ভাবছে? নিজেকে ধমক দিল সে। কিন্তু ভয় তাড়াতে পারল না মন থেকে। আবার তাকাল এদিক ওদিক। অস্বস্তি

বোধ করছে। আবার বোঝাল মনকে, 'মানুষ মরে গেলে আর কিছু করতে পারে না। ভূত-ফূত সব বাজে কথা।' গর্তটার কাছে এসে দাঁড়াল সে, ম্যাবরির ভয়ে যেটাতে লুকিয়েছিল, মোহরটা যেটাতে ফেলেছে ওমর, সেই গর্ত। আবার ফিরে তাকাল। চাঁদের আলোয় রহস্যময় মনে হচ্ছে বনভূমিকে, কিছু কিছু ছায়াকে মানুষের ছায়া বলে ভুল হচ্ছে। হ্যামার আর ইমেট চাব লুকিয়ে থেকে তাকে দেখছে না তো?

ভীষণ দুরুদুরু করছে বুক। গর্তে নেমে পড়ল বব। আশ্চর্য, মাটিতে হাত দিতেই পেয়ে গেল মোহরটা। হাতে নিয়েই মনে পড়ল ওটার অশুভ ক্ষমতার কথা। কাঁপা হাতে মোহরটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। গর্তের বাইরে চ্যাপ্টা একটা পাথরে মোহরটা রেখে দু'হাতে ভর দিয়ে গর্ত থেকে বেরোতে গেল। কিন্তু গর্তের দেয়ালে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে আটকে গেল পিস্তল, হ্যাঁচকা টানে আবার নেমে আসতে বাধ্য হলো বব। বেল্ট থেকে খুলে গর্তে পড়ে গেল পিস্তল। যতই তাড়াহুড়ো করতে চায় আরও দেরি হয়ে যায়। বসে পড়ে পিস্তলটা হাতড়ে খুঁজতে শুরু করল।

হাতে ঠেকল গোল একটা কিছু, পিস্তল নয়। জিনিসটার আকার আর ওজন চমকে দিল তাকে। কিন্তু ডাবলুনটা তো রেখে দিয়েছে বাইরে, পাথরের ওপর। তাহলে এটা কি আরেকটা? উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ডাবলুনটা আগের জায়গায়ই আছে। কিন্তু হাতেও তো আরেকটা। চাঁদের আলোয় চমকাচ্ছে, ভুল হতেই পারে না! তারমানে দুটো হলো? অসম্ভব···বিশ্বাস করতে পারছে না সে। উত্তেজনায় কাঁপছে, কপাল বেয়ে দরদর করে ঝরছে ঘাম। ভূতের ভয় ফিরে এল আবার মনে। নিশ্চয় ডেকেইনির ভূতই এই কাণ্ড করছে, তাকে বোকা বানানোর জন্যে। কেন যে এসেছিল মরতে? কেন এসেছিল অভিশপ্ত মোহরের লোভে···

আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতেই চকিতে দূর হয়ে গেল ভূতের ভয়। ঝট করে বসে পড়ে আঙুল দিয়ে খামচে মাটি সরাতে শুরু করল। এক গাদা গোল জিনিস হাতে ঠেকল, গলা শুকিয়ে গেল তার। বেড়ে গেল বুকের দুরুদুরু। দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন। গর্তের দেয়ালে হেলান না দিয়ে আর পারল না, এক মুঠো গোল জিনিস তুলে নিয়ে দেখল। শব্দ শুনল। না, কোন ভুল নেই। মোহরই। পেয়েছে! পেয়ে গেছে সে ডেকেইনির গুপ্তধন! 'মোহর! মোহর!' চেঁচিয়ে উঠল সে নিজের অজান্তেই। ভুলে গেল পিস্তলের কথা, ভুলে গেল কোথায় রয়েছে। বসে পড়ে আবার মাটি খুঁড়তে শুরু করল আঙুল দিয়ে। আরও মোহর ঠেকল হাতে। হাতে জোরে কামড় মারল সে। জেগেই আছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না।

জামা পাজামায় পকেট নেই, মোহর নিয়ে যেতে পারবে না, যেখানে ছিল সেখানেই ওগুলো আবার ফেলে বেরোতে যাবে, এই সময় কানে এল মানুষের কথা। ধড়াস করে এত জোরে লাফ মারল হৃৎপিণ্ড, ববের মনে হলো বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার চিনতে পারছে কণ্ঠস্বর। হ্যামার।

'এদিকেই কোথাও লুকিয়েছে ব্যাটারা, তখনও বলেছি, এখনও বলছি,' তিক্ত শোনাল হ্যামারের কণ্ঠ।

'তো হলো কি তাতে?' ইমেট চাব বলল। 'ঘাবড়ানোর কি আছে? কাল বেড়

দিয়ে ধরব ব্যাটাদের!'

'ওরা কি করছে যদি জানতে পারতাম,' বলল হ্যামার। পরক্ষণেই স্বর বদলে গেল। 'আরে, ওটা কি?'

দ্রুত এগিয়ে এল দুই জোড়া পায়ের শব্দ, শুনতে পেল বব। গর্তের পারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে।

'আরে, মোহর,' ইমেট চাবের বিস্মিত কণ্ঠ, 'এটা এল কোথা থেকে?'

'নিশ্চয় মোহরগুলো খুঁজে পেয়েছে ব্যাটারা। নেয়ার সময় পড়ে গেছে কোনভাবে।'

'না, ম্যাবরির পকেট থেকে পড়েছে। ওর কাছে একটা মোহর ছিল, মনে আছে? এখানেই পড়েছিল সে, এখান থেকেই তুলে নিয়ে গেছি। ওই যে, রক্ত। মোহরটা রাখতে পারল না বেচারা। আর দেখেই বা কি হবে? যেখানে গেছে, ওখানে মোহর কোন কাজে লাগবে না।'

'হাত সরাও, ইমেট, আমি আগে দেখেছি, ওটা আমার,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল হ্যামার।

'কি হলো, বিগ? এটা কি ধরনের ব্যবহার? একটা মোহরই তো, এটার জন্যে...'

'দাও বলছি ওটা!' হ্যামারের গর্জনে গর্তে থেকেও কেঁপে উঠল বব।

'নইলে কি করবে?' পাল্টা গর্জন করে উঠল ইমেট চাব। 'ও ছুরি...ছুরির ভয় দেখাচ্ছ...,' কথা বন্ধ হয়ে গেল তার আচমকা, বিচ্ছিরি ঘড়ঘড়ানি শোনা গেল। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ভারি কিছু, পাথরে ঘষাঘষির শব্দ হলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর চুপ।

জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল বব, অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে, চিৎকার করে উঠেছিল প্রায়। মনের পর্দায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ছবি, গর্তের বাইরে কি ঘটেছে।

'আমার সঙ্গে ইতরামি...আমার সঙ্গে...,' ভয়ংকর কণ্ঠে বিড়বিড় করল হ্যামার। 'হুঁহ্!'

পায়ের শব্দ চলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বব। কিন্তু আরও মিনিট দশেক বাইরে বেরোনোর সাহস হলো না। কুঁকড়ে বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরার অবস্থা। অবশেষে আস্তে করে সোজা হয়ে উঁকি দিল গর্তের বাইরে। এক নজরই যথেষ্ট, দ্বিতীয় বার আর ইমেট চাবের গলাকাটা লাশটার দিকে চাওয়ার সাহস হলো না।

মোহর নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করল না বব, পিস্তলটা খুঁজে বের করার জন্যেও থামল না আর। এক লাফে বেরিয়ে এসে সোজা দৌড় দিল নৌকার দিকে। বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল, পায়ের চামড়া ছড়ে গেল ধারাল পাথরে লেগে, কেয়ারই করল না। নৌকার ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাঁপা আঙুলে কি ভাবে দড়ি খুলল, বলতে পারবে না, নৌকাটা এনে ফেলল পানিতে। লাফিয়ে উঠে বসে দাঁড় বেয়ে তীর বেগে ছুটল। ঘোরের মধ্যে যেন পেরিয়ে এল প্রণালীটা, নৌকা বাঁধল ঘাটে, একেক লাফে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি

ডিঙিয়ে উঠে এল ওপরে।

'থামো! কে?' বরফ-শীতল ওমরের কণ্ঠ।

'আ-আমি, বব,' হাঁপাচ্ছে বব।

'উঠে এসো।'

চত্বরে উঠে এলো বব। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওমর। অন্য দু'জন তার পেছনে।

'কোথায় গিয়েছিলে?' কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'দ্বীপে।...আ-আমি পেয়েছি...,' হাঁপানোর জন্যে কথা বলতে পারছে না।

ধারাল ছুরির মত কেটে বসল যেন ওমরের কথা, 'কি পেয়েছ সেটা পরের কথা। পাহারা ছেড়ে গিয়েছ কেন?'

'কিন্তু...'

'কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না। গেছ কিনা, বলো আগে।'

'হ্যাঁ।'

'অন্যায় করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কক্ষনো করবে না। ভাগ্য ভাল, কিছু ঘটেনি। কিন্তু ঘটতে পারত। সবাইকে বিপদে ফেলে দিতে পারতে।'

'সরি! আর এমন হবে না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এটা করলে কেন?'

'ডাবলুনটা আনতে গিয়েছিলাম।'

'কী?' ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে এল ওমর। 'সেই অভিশপ্ত মোহর?'

'হ্যাঁ। ভাবলাম...'

'ভাবাভাবি পরের কথা। মোহরটা এনেছ? জলদি ফেলো, ছুঁড়ে ফেলো পানিতে।'

'আনতে পারিনি। হ্যামার নিয়ে গেছে।'

'কি করে জানলে?'

'আমি গর্ত থেকে তুলে একটা পাথরে রেখেছিলাম। একটু পরেই হ্যামার আর ইমেট চাব এল। মোহরটা দেখে এ বলে আমি নেব, ও বলে আমি নেব। কথা কাটাকাটি, শেষে ইমেট চাবের গলা ফাঁক করে দিল হ্যামার। মোহরটা নিয়ে চলে গেল।'

মুসা আর কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। 'কি, বলেছিলাম না, মোহরটা অভিশপ্ত?' বদলে গেছে তার কণ্ঠস্বর, ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে উঠেছে। 'বউনের মোহরের জন্যে আরেকজন মরল। হ্যামার নিয়ে গিয়ে কপালে দুর্গতি টেনে আনল আর কি।' ববের দিকে ফিরল আবার সে। এতক্ষণ কি করলে?'

'গর্তে বসেছিলাম। আরও অনেকগুলো পেয়েছি।'

'কি পেয়েছ?'

'মোহর,' বোম ফাটাল যেন বব।

চুপ হয়ে গেল সবাই।

'আরও মোহর পেয়েছ?' বলল অবশেষে কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'কতগুলো?'

'কয়েকশো হতে পারে, কিংবা কয়েক হাজার,' হাত উল্টাল বব।

'শিওর?' ওমর বলল।

'শিওর। হাতে নিয়ে দেখেছি।'

'ঘুমিয়ে পড়োনি তো?' ওমরের কণ্ঠে স্পষ্ট সন্দেহ। 'স্বপ্ন দেখেছ?'

এক পা সামনে বাড়ল বব। চেঁচিয়ে উঠল, 'স্বপ্ন? মোটেই না। বললাম তো, হাতে নিয়ে দেখেছি।'

এগিয়ে এল কিশোর। 'কোথায় পেলে বব?'

'ওমরভাই যে গর্তে ডাবলুনটা ফেলে দিয়েছিল। ম্যাবরির ভাড়া খেয়ে ওটাতেই লুকিয়েছিলাম।'

'নাহ্, বিশ্বাস হচ্ছে না!' গাল চুলকাল ওমর, মাথা নাড়ল আনমনে। 'এত সাধারণ একটা গর্তে মোহর লুকিয়েছিল ডেকেইনি?'

'হ্যাঁ, তাই,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'এখন বুঝতে পারছি। ম্যাপে পাহাড় বোঝানো আছে, আঁকাবাঁকা লম্বা দাগ দিয়ে, দাগের এক জায়গায় ছোট একটা গোল চিহ্ন, তারমানে গর্তটা। ওই গর্তে মোহর রেখে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল ডেকেইনি। বব, হ্যামার আর ইমেট চাব ওখানে কি করতে এসেছিল?'

'কথাবার্তা শুনে তো মনে হলো, আমাদের খুঁজতে।'

'কি কি বলেছে, শুনেছ ভালমত?'

'খুব বেশি কিছু বলেনি। তবে একটা কথা জরুরী মনে হলো, আগামীকাল বেড় দিয়ে নাকি ধরবে আমাদের।'

'উঁউঁহ্!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'পুকুরে জিয়ানো মাছ পেয়েছে আর কি। হারামির বাচ্চা! কিভাবে ধরবে, বলেছে?'

'না তবে কথাটায় বেশ জোর ছিল। এমনভাবে বলল, যেন আগামীকাল বিশেষ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তাতে আমাদের ধরা খুব সহজ হয়ে যাবে।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। 'বুঝতে পারছি না। কিভাবে আমাদের ধরবে? কিছুক্ষণ আগে ছিল চারের বিরুদ্ধে দুই, এখন হয়েছে এক। ম্যাবরি আহত, তাকে গোণার বাইরে রাখা যায়...'

'মনে হয় মারা গেছে,' বলে উঠল বব। 'ইমেট চাব বলছিল, ম্যাবরি এমন এক জায়গায় গেছে, যেখানে মোহর কোন কাজে লাগবে না তার।'

'অভিশপ্ত ডাবলুনের আরও শিকার,' নরম গলায় বলল ওমর। 'ইমেটের লাশ কোথায়?'

'গর্তটার ধারেই পড়ে আছে।'

'কাল সকালেই ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে। লাশ দেখতে ফিরে এসে না আবার মোহর আবিষ্কার করে বসে হ্যামারের বাচ্চা। এখন রাতের বেলা কিছু

করতে পারব না, তবে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগব। চলো, ঘুমিয়ে নিই। মুসা, তুমি পাহারায় থাকো। ববের মত ঘাড়ে ভূত চাপবে না তো?'

হাসল মুসা। মাথা নাড়ল।

ওমর আর কিশোরের পেছন পেছন ঘরে নেমে এল বব। শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করতে লাগল, ঘুম এল না সহজে। ঘুমের মধ্যেও দুঃস্বপ্ন দেখল, হ্যামার আর লুই ডেকেইনি হাতে হাত মিলিয়েছে, মস্ত দুই ছুরি নিয়ে তাড়া করছে তাকে।

আট

ধরমড়িয়ে উঠে বসল বব। অন্ধকার রয়েছে এখনও, আবছা একটা মূর্তিকে নড়াচড়া করতে দেখল সে। আরও ভালমত দেখার জন্যে সোজা হয়ে বসল।

বাইরের কেউ নয়, ওমর। ববকে নড়াচড়া করতে দেখে বলল, 'উঠে পড়ো। বেরোনোর সময় হয়েছে।'

'এখনও ভোর হয়নি, না?'

'হয়নি, তবে হবে। তারার আলো কমে গেছে, পাঁচ মিনিট পরেই ভোরের আলো ফুটবে। আরে এই মুসা, আবার শুয়ে পড়লে যে? ওঠো, ওঠো, নারকেল ভেঙে নাস্তা সেরে নাও। আমি বন্দুকগুলো গুছিয়ে নিই।'

হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল মুসা। 'দরকার পড়বে?'

'শত্রু যখন রয়েছে, পড়তেও পারে।'

'কিশোর কই?'

'ছাতে, পাহারা দিচ্ছে, নাস্তাও সেরে নিচ্ছে। জলদি করো. রেডি হয়ে নাও।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'হায় আল্লাহ, মোহরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ওগুলো আনতে যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। ওগুলোও আনতে হবে।'

নারকেল ভাঙল মুসা। ঢকঢক করে পানি খেলো। নারকেল সুদ্ধ অর্ধেকটা মালা ববকে দিয়ে বাকি অর্ধেকটা দিতে গেল ওমরকে।

'আমি খেয়েছি,' বলল ওমর। 'তোমরা জলদি সেরে নাও।'

'নৌকায় বসেই খেতে পারব, চলুন যাই,' মুসা বলল।

চত্বরে বেরিয়ে কিশোরকে ডাকল ওমর, ছাত থেকে নামতে বলল। ফেকাসে নীল হয়ে গেছে আকাশ, পুব দিগন্তে লালচে আলো। সূর্য উঠবে। কি ভেবে ছাতে উঠে গেল ওমর। ল্যাগুন আর তার আশপাশে যতদূর দেখা যায়, দেখল। হ্যামারকে দেখা যাচ্ছে না, উভচরটাও না। ফেরেনি সিডনি বারডু।

একটা করে মাসকেট নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা, নৌকায় উঠল।

পাঁচ মিনিটে পেরিয়ে এল প্রণালী, পাথরের খাঁজে তুলে রাখল নৌকাটা।

বব আর কিশোরকে দাঁড়াতে বলল ওমর। 'মুসা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কাজ আছে, সেরে ডাকব। তোমরা পাহারা দাও। হ্যামারকে দেখলে জানাবে।'

একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল কিশোর। কি কাজ সারতে গেছে ওমর ভাই, অনুমান করতে পারছে। কিছুক্ষণ পর উল্টো দিকে পানিতে ঝপাং করে শব্দ হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'ভাল,' বিড়বিড় করল সে, 'ইমেট চাবের লাশ আর দেখতে হলো না আমাকে। সোনার লোভ কত মানুষের যে সর্বনাশ করল!'

'স্বর্ণ সর্বনাশ করেনি, মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে,' গম্ভীর হয়ে বলল বব।

ওমরের ডাক শোনা গেল। তাড়াতাড়ি উঠে ছুটল বব আর কিশোর।

'বব,' ওমর বলল, 'আগে হাঁটো, পথ দেখাও। মোহর তুমি খুঁজে পেয়েছ, আগে গর্তে নামার সম্মান তোমার প্রাপ্য।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ববের মুখ। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সঙ্গীদের। গর্তটার কিনারে এসে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওটা।'

'আল্লাহ্! সত্যিই তো,' গর্তে উঁকি দিয়ে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওমর।

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোর আর মুসার মুখ।

লাফিয়ে গর্তে নেমে এক মুঠো মোহর তুলল ওমর। 'ঠিকই বলেছ তুমি, বব। কয়েক হাজারের কম না।'

'আরও বেশিও হতে পারে,' বলল বব। 'গুণব নাকি?'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, 'মাথা গরম করলে চলবে না। এখানে বসে গোণা রিসকি হয়ে যাবে, আর গোণার দরকারই বা কি? যা আছে তো আছেই। এগুলো এখান থেকে নিতে হলে ওই দুর্গেই নিতে হবে। তারপর মোহর পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে ওখানে, কতদিন কে জানে। ঝড় উঠলে, সাগরের অবস্থা খারাপ হলে বেরোতে পারব না, দ্বীপে আসতে পারব না, মোহর সামলাতে গিয়ে শেষে না খেয়ে মরতে হবে। ওদিকে হ্যামার কি করছে সে-ই জানে। চুপ করে বসে থাকার পাত্র সে নয়, নিশ্চয় কোন শয়তানী বুদ্ধি আঁটছে। শীঘ্রি কিছু একটা করবে সে। আমাদের হুঁশিয়ার থাকা দরকার।'

'ঠিকই বলেছ,' গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ওমর। 'তৈরি থাকতে হবে আমাদের। মুসা, নারকেল কুড়াও গিয়ে। যত বেশি পারো, জমাও। কিশোর, জাহাজটায় যেতে পারবে আবার?'

'পারব। কেন?'

'বারুদ আনতে হবে।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করল কিশোর।

'বব,' বলল ওমর, 'যাও তো, এক দৌড়ে গিয়ে বালতিটা নিয়ে এসো, ফুটা বালতিটা। মোহরগুলো নিতে হবে। আমি বাইরে তুলে রাখছি।'

'হ্যামার এলে?' মুসা প্রশ্ন করল।

'আসুক। চারজনের বিরুদ্ধে যদি লাগার সাহস থাকে, আসুক না। পকেটে অভিশপ্ত ডাবলুন, সে-তো এমনিতেই মরা। যাও, তোমরা যার যার কাজে চলে যাও।'

নারকেল কুড়িয়ে স্তূপ করে ফেলল মুসা। বালতি নিয়ে এলো বব। কিশোরও

বারুদের পিপে নিয়ে হাজির—জাহাজে ঢোকা আর বেরোনোর পথ পেয়ে গেছে, কাজটা আর মোটেই কঠিন নয় এখন। মোহর তুলে গর্তের পাড়ে জমাচ্ছে ওমর।

সূর্য অনেক উপরে উঠেছে। কড়া রোদ। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল ওমর, 'মুসা, নারকেল ভাঙবে? খুব খিদে পেয়েছে।'

'এখুনি আনছি,' নারকেল আনতে চলে গেল মুসা।

'বারুদ কতখানি আনলে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'আধ পিপার বেশি। এর বেশি আর বইতে পারলাম না।'

'ওতেই চলবে। দুর্গেও কিছু আছে। ছোটখাট লড়াই ঠেকানো যাবে।'

'লড়াই হবেই? কিন্তু বুঝতে পারছি না, লড়াইটা কার বিরুদ্ধে করব? হ্যামার তো একলা,' নিজের সঙ্গেই আলোচনা করছে যেন কিশোর। 'যাকগে, যখন হয় তখন দেখা যাবে। এখন মোহর সরানো দরকার।'

'হ্যাঁ,' ওমর বলল, 'অনেক মোহর। সরাতে সময় লাগবে। তুলছিই শুধু, শেষ আর হয় না।'

নারকেল ভেঙে নিয়ে এল মুসা। গর্তের পাড়ে বসে খেলো চারজনে, জিরিয়ে নিল।

'কিশোর,' ওমর বলল, 'তুমি আর মুসা মোহরগুলো দুর্গে নিতে থাকো। আমি আর বব তুলে বালতি ভরে দিচ্ছি।'

বার বার নৌকা নিয়ে আসা আর যাওয়া, বেশ পরিশ্রমের কাজ, গর্ত খুঁড়ে মোহর তোলাও কম মেহনত নয়। সময় লাগল অনেক। কিন্তু অবশেষে শেষ হয়ে এল কাজ। শেষবারের মত বালতি ভরা হলো মোহর দিয়ে। আর নেই। ওমরের অনুমান, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মোহর নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'যাক বাবা, সারলাম, বাঁচা গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। 'কিন্তু হ্যামারের পাত্তা নেই কেন? কি করছে?' একটা শব্দ শোনা গেল। 'ওই যে সাড়া বোধহয় মিলল। বব, এক দৌড়ে গিয়ে দেখে এসো তো।'

সৈকতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল বব। হাঁ করে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত তারপর ঘুরে দৌড় দিল। দূরে থাকতেই চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি আসুন, জলদি! পালাতে হবে!' নৌকার দিকে ছুটল সে।

পাথরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। 'কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'সৈন্য!' জবাব দিল বব। 'ম্যারাবিনা থেকে, সৈন্য নিয়ে এসেছে,' কণ্ঠে আতংক, 'অনেক সৈন্য। এদিকেই আসছে ওরা।'

আর দেরি করল না ওমর। ছোঁ মেরে মাসকেট তুলে নিল, হাত বাড়াল বালতির দিকে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বালতিতে পা লাগিয়ে টান মেরে বসল কিশোর, কাত হয়ে পড়ে গেল বালতি, ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত মোহর। কুড়িয়ে তুলতে গেল আবার ওগুলো।

'রাখো রাখো,' বলে উঠল ওমর। 'তোলার সময় নেই। জলছদ নৌকার দিকে

দৌড় দাও।'

নৌকা পানিতে নামিয়ে দাঁড় হাতে তৈরি হয়ে আছে বব। কিশোর আর মুসা উঠল। গভীর পানিতে নৌকা ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল ওমর। এক পাশে কাত হয়ে বেশ খানিকটা পানি উঠল নৌকায়, উল্টে যাচ্ছিল প্রায়।

পাথরের স্তূপের কাছ থেকে শোনা গেল সম্মিলিত চিৎকার। ওদের দেখে ফেলেছে সৈন্যরা। খানিকক্ষণ পর আবার শোনা গেল চিৎকার।

'মোহরগুলোও দেখেছে,' ববের হাত থেকে দাঁড় নিয়ে জোরে জোরে বাইতে শুরু করল ওমর।

কিশোরের ছড়িয়ে ফেলা মোহরগুলোই প্রাণ বাঁচাল ওদের। রাইফেলের নিশানা করে ফেলেছিল কয়েকজন সৈন্য, ট্রিগার টিপতে যাবে, এই সময় তাদের কানে এল, 'মোহর! মোহর!' চিৎকার। অন্যেরা লুটছে, তারাই বা বাদ পড়ে কেন? ছুটল তারাও। গিয়ে দেখে সত্যি মোহর কুড়াচ্ছে তাদের সঙ্গীসাথীরা, রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তারাও কুড়াতে লেগে গেল। হ্যামারের শত চিৎকারেও কান দিল না কেউ।

ইমেট চাবের অটোমেটিকটা নিয়ে নিয়েছিল হ্যামার, ওটা নিয়েই ছুটে এল সৈকতে। রাগে, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে, হাত ঠিক রাখতে পারল না, এলাপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল, নৌকার ধারেকাছে এল না একটাও।

সব মোহর কুড়িয়ে পকেটে ভরল সৈন্যরা, আর একটাও পড়ে রইল না। রাইফেল তুলে নিয়ে ফিরে এল আবার সৈকতে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দূরে চলে এসেছে নৌকা। গুলি করল সৈন্যরা, দু'একটা বুলেট নৌকার একেবারে কাছে পানি ছিটাল, কিন্তু লাগল না কারও গায়ে।

'গুলি করো, কিশোর,' বলল ওমর। 'কারও গায়ে লাগুক না লাগুক, ভয় দেখাও।'

গর্জে উঠল কিশোরের মাসকেট। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। এত ধাক্কা দেবে কল্পনাও করেনি সে, বাঁকা হয়ে গেল এক পাশে। পাথরে বাড়ি লেগে বিকট শব্দ তুলে সৈন্যদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বল। চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল ওরা। ওখান থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকল একনাগাড়ে।

নিরাপদেই সিঁড়ির গোড়ায় এসে ভিড়ল নৌকা।

'জলদি উঠে যাও,' বলল ওমর। 'একবারে একজন করে।'

লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল তিন কিশোর। ঘাটের কাছে নৌকাটাকে শক্ত করে বেঁধে ওমরও উঠে এল। 'হাউফ্‌ফ্‌,' করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল অন্যদের পাশে, একটা নিচু পাথরের দেয়ালের আড়ালে। 'বড় বাঁচা বেঁচেছি। কিন্তু ব্যাটারা এল কিভাবে?'

ছাতে উঠল ওমর, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল কিনারে। সাবধানে উঁকি দিল। যা দেখার দেখে পিছিয়ে এসে বলল, 'অবস্থা ভাল না।'

'কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'জাহাজ নিয়ে এসেছে ব্যাটারা, সাইজ দেখে মনে হলো ট্রলার। কোস্ট

গার্ডদের বোধহয়। কিন্তু জানল কিভাবে…'

'বারডু, সিডনি বারডু,' বলল কিশোর। 'ও-ই গিয়ে খবর দিয়েছে ম্যারাবিনায়, সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল নিশ্চয় হ্যামার। অ্যালেন কিনি মরেছে বটে, কিন্তু তার দোসরগুলো তো আছে। কোনটার চেয়ে কোনটা কম শয়তান না।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' তর্জনী নাড়ল ওমর। 'ইউনিফর্ম পরা ওই শয়তানটাকেও দেখেছি সৈন্যদের সঙ্গে, ওই যে ওই অফিসারটা, যেটা এসে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে।'

'কতজন আছে?'

'ঠিক বোঝা গেল না, তিরিশ-চল্লিশ কিংবা তার বেশিও হতে পারে।'

'হুঁ। ভাগ্যিস, নারকেলগুলো এনে রেখেছিলাম। আরি…,' শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর।

'বারডু! বারডু আসছে,' চেঁচিয়ে বলল মুসা। হাত তুলে দেখাল, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উড়ে আসছে বিমানটা।

কপালে হাত রেখে দেখল ওমর, মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আমাদের উড়চরটাই। সহজে ছাড়বে না, বোঝা যাচ্ছে।'

ছাতে উঠে এল চারজনেই, নিচু দেয়ালের ছোট ছোট ফোকর (বন্দুকের নল ঢুকিয়ে শত্রুদের ওপর গুলি চালানোর জন্যে তৈরি হয়েছে ফোকরগুলো) দিয়ে দেখছে। সৈকত থেকে সামান্য দূরে জঙ্গলের ছায়ায় গিয়ে বসেছে সৈন্যরা। হাত নেড়ে তাদেরকে কি যেন বলছে হ্যামার।

ফিরল হ্যামার। এগিয়ে এল সৈকত ধরে। দুর্গের দিকে চোখ।

'কি ব্যাপার?' বিড়বিড় করল ওমর।

'আরি, মিল করতে আসছে মনে হয়!' অবাক কণ্ঠে বলল কিশোর।

হ্যামারের হাতে একটা লাঠি, মাথায় শাদা কাপড় বাঁধা। পানির একেবারে কিনারে এসে উঁচু একটা পাথরে চড়ল, লাঠিটা মাথার ওপর তুলে কাপড় নাড়ল জোরে জোরে। চেঁচিয়ে বলল, 'এই, শুনছ? এইই, তোমরা?'

'আমাকে কভার দাও,' ছেলেদেরকে বলল ওমর, আমি বললেই গুলি চালাবে।' হ্যামারকে বলল, 'কী? চেঁচাচ্ছ কেন?'

'একটা অফার দিতে এসেছি,' বলল হ্যামার।

'বলো।'

'মোহরগুলো দিয়ে দাও, বিনিময়ে তোমাদেরকে ম্যারাবিনায় পৌঁছে দেব।'

হাসল ওমর। 'ধন্যবাদ। ম্যারাবিনায় যাব না।'

'মোহরগুলো দেব না?' রেগে উঠছে হ্যামার।

'যা পেয়েছ পেয়েছ, আর একটাও না।'

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত চাপল হ্যামার। 'ধরে এমন ধোলাই দেব, গলার এই জোর থাকবে না। বলতে দিশে পাবে না, কোথায় রেখেছ মোহর।'

'ধোলাই তো পরের কথা, আগে ধরতে হবে তো আমাদের?'

'শাআলা!' গাল দিয়ে উঠল হ্যামার। 'দাঁড়া, আগে ধরি, জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে

নেব।' মুখ খিস্তি করে আরও কয়েকটা গাল দিল সে, ঘুসি পাকিয়ে হাত ঝাঁকাল বার কয়েক। দুপদাপ করে নেমে ছুটে গেল নিজের লোকজনের কাছে। মিনিটখানেক পর তিনজন সৈন্য রাইফেল হাতে ছুটে গেল ট্রলারের দিকে।

'কি করতে চায়?' নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর।

'নৌকা নিয়ে আসবে মনে হচ্ছে,' বলল ওমর। 'লড়াই করতেই হচ্ছে। চত্বরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে চকচকে সোনালি মোহরগুলো। 'তেমন বুঝলে সব মোহর পানিতে ফেলে দেব, তবু ব্যাটাদেরকে দেব না। চলো, রেডি হই।' ছাত থেকে নেমে বলল সে, 'আমাদের কাছে মাসকেট আছে, জানে হ্যামার, কিন্তু ওগুলোর খবর জানে না,' হেসে কামানগুলো দেখাল। 'সুইভেল-গানটার কথাও জানে না। পয়লা চোটেই ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে।'

কাজে লেগে গেল চার অভিযাত্রী। কড়া রোদ মাথার ওপরে। দরদর করে ঘামছে ওরা, কামান-বন্দুকে বারুদ ঠাসছে। পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটা গোলা তুলে নিয়ে বলল মুসা, 'এটা যদি লাগে হ্যামার মিয়ার মুখে? ডেনটিস্ট্ দেখানোর আর দরকার পড়বে না?' বলেই ঢুকিয়ে দিল একটা কামানে।

তার রসিকতায় হাসল অন্যেরা।

বেজায় ভারি সুইভেল-গানটা। নিচ থেকে এনে প্রণালীর দিকে নিশানা করে বসাতে গিয়ে ঘামে চুপচুপে হয়ে গেল একেকজন। বারুদের পিপা, গুলি, পিস্তল-বন্দুক, এমনকি ছুরি-বল্লম যা আছে, সব নিয়ে আসা হলো ওপরে, হাতের কাছে রাখা হলো। এভাবে দেখল ওমর, ওভাবে দেখল, সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।'

'আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়?' প্রস্তাব রাখল কিশোর। 'লুই ডেকেইনির নিশানটা উড়িয়ে দিই?'

'খুব ভাল হয়,' আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল বব। 'দারুণ হয়।'

'ভাল বলেছ,' হাসিতে ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার।

'মন্দ বলোনি,' ওমরও হাসছে।

ববের উৎসাহই বেশি। ছুটে নিচে গিয়ে কালো পতাকাটা নিয়ে এল সে। নৌকার দাঁড়ের মাথায় বেঁধে উড়িয়ে দিল ছাতের ওপরে। সুর করে গেয়ে উঠল ট্রেজার আইল্যাণ্ডের জলদস্যুদের সেই বিখ্যাত গান, 'ফিফটিন মেন অন দা ডেড ম্যানস চেস্ট, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বট্‌ল্ অভ্ রাম।'

ববের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরাস গাইল অন্যেরাঃ 'ড্রিংক অ্যাণ্ড দা ডেভিল হ্যাড ডান ফর দা রেস্ট, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বট্‌ল্ অভ রাম।'

ফোকর দিয়ে দেখল কিশোর, এদিকেই চেয়ে আছে সৈন্যরা। মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে, কিন্তু তাজ্জব যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ওরা ভাবছে, আমরা পাগল হয়ে গেছি।'

'ভুল ভাবছে?' হাসিতে উজ্জ্বল ওমরের মুখ। হঠাৎ সাগরের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে বলল, 'মাথা নামাও! ওরা আসছে।'

ল্যাগুনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে একটা নৌকা, দাঁড় টানছে চারজন লোক। তীর ঘেঁষে চলছে। গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। হ্যামারকে মাথা নিচু করে সেদিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। খানিক পরে আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে এল নৌকাটা।

'কতজন?' বিড়বিড় করল কিশোর।

'চোদ্দ-পনেরোজন হবে,' আন্দাজ করল ওমর।

দ্বীপের চোখা প্রান্তের কাছে চলে এল নৌকা। লোকের ভারে প্রায় ডোবে ডোবে। বার বার হাত ঝাঁকি দিয়ে কি যেন বলছে হ্যামার, বোধহয় আরও জোরে দাঁড় টানতে বলছে।

'আমি না বললে গুলি করবে না,' নিচু গলায় নির্দেশ দিল ওমর।

আরও এগিয়ে এল নৌকা।

হঠাৎ আদেশ দিল ওমর, 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল মাসকেট, বার বার তীরের পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো বিকট আওয়াজ। নৌকার পাশের পানি ছিটকে উঠল গুলি লেগে। পাটাতনে নুয়ে পড়ে গেল নৌকার একজন। কিন্তু দাঁড় বাওয়া থামাল না ওরা, দ্রুত এগিয়ে এল।

'গুলি করো,' আদেশ দিল আবার ওমর। 'থেমো না।'

আরও দু'জন সৈন্য পড়ে গেল। দু'হাত শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল একজন, বাঁকা হয়ে পানিতে পড়ল ঝপাং করে। একবার কাত হয়ে আবার সোজা হলো নৌকাটা, থামল না, এগিয়ে আসছে আরও দ্রুত।

মাসকেট ফেলে সুইভেল-গানের কাছে চলে এল ওমর। নৌকার দিকে নল ফেরাতে ফেরাতে অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। টাচ-হোলে কিছু আলগা বারুদ ঢেলে দিয়ে কম্বল-ছেঁড়া দিয়ে বানানো সলতেয় আগুন ধরিয়ে দাগল কামান। নলের মুখ দিয়ে ঝলকে বেরোল আগুন, আগুনের ফুলঝুরি ছিটিয়ে ছুটে গেল এক ঝাঁক বল। প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা ফেটে গেছে মনে হলো অভিযাত্রীদের, কামানের নলের সামনে কালো ধোঁয়ার মেঘ।

প্রতিক্রিয়া দেখে বোবা হয়ে গেল যেন ওমর। এত জোরে পিছু-ধাক্কা দেবে সুইভেল-গান, কল্পনাও করেনি সে। প্রায় শ'খানেক বল ভরে দিয়েছিল, সব ছুটে গেছে ঝাঁক বেঁধে। টগবগ করে ফুটতে শুরু করল যেন কিছুটা জায়গায় পানি, আরেকটু হলেই গিয়েছিল উল্টে নৌকা। সৈন্যদের গোঙানি আর আতংকিত চিৎকার শোনা গেল। চারজনের মাত্র একজনের হাতে দাঁড় রয়েছে, কিন্তু ওই তাণ্ডবের মাঝে সে-ও বাইতে পারছে না, কিংবা বাওয়ার কথা ভুলেই গেছে। সব শব্দ ছাড়িয়ে শোনা যাচ্ছে হ্যামারের কুৎসিত গালাগাল। ধাক্কার চোটে নৌকার নাক ঘুরে গেছে আবার যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।

সামলে নিল আবার সৈন্যরা। কারও দাঁড় পানিতে পড়ে গিয়েছিল, কারও বা নৌকার পাটাতনে, তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দ্বিগুণ বেগে দাঁড় বেয়ে ছুটে গেল তীরের দিকে। পালাচ্ছে।

পাগলের মত হাত চালাল ওমর। ওদের পালাতে দেয়া চলবে না। সুইভেল-গানে আবার বল ভরে বারুদ ঠাসছে। চোখ তুলে দেখল, তীরের কাছে চলে গেছে নৌকা। তাড়াতাড়ি সলতে লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে গুলি করল আবার।

বু-ম্-ম্ করে কানফাটা গর্জন তুলে আবার তপ্ত বল ছিটাল সুইভেল-গান।

এবার আর রেহাই পেল না নৌকা, উল্টে গেল। তীরের কাছে অগভীর পানিতে মৃদু ঢেউয়ে দুলছে। জনাতিনেক সৈন্য হাত-পা ছুঁড়ছে পানিতে, বাকিরা স্থির হয়ে ভাসছে। দুর্বল ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে বালি খামচে খামচে নিজেকে শুকনোয় টেনে তোলার চেষ্টা করছে একজন। হ্যামারসহ আরও তিনজন ছপছপ করে হাঁটু পানি ভেঙে পড়িমড়ি করে উঠল ডাঙায়, উঠেই দৌড় দিল জঙ্গলের দিকে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল পাথরের স্তূপের আড়ালে।

'গুলি করো,' নির্দেশ দিল ওমর। 'ঝাঁঝরা করে দাও নৌকার তলা, যাতে ওটা নিয়ে আর না আসতে পারে,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে আবার মাসকেট তুলে নিয়ে গুলি চালাল। নৌকার উপুড় হয়ে থাকা তলা থেকে কাঠের চিলতে উড়ে গেল। বল ভরে গুলি চালাল আবার। পরের পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেল ওরা। ওমরের প্রায় প্রতিটি গুলিই লক্ষ্য ভেদ করল, অন্যদের কোন কোনটা লাগল, তবে বেশির ভাগই মিস হলো। তাদেরই কারও একটা গুলি নৌকায় না লেগে লাগল গিয়ে ক্রল করে ওঠার চেষ্টা করছে যে আহত লোকটা, তার গায়ে। পড়ে গেল সে কাদা পানিতে, স্থির হয়ে রইল।

'ভয় পেয়েছে ব্যাটারা,' দম নিয়ে বলল ওমর, 'এত খোলামেলাভাবে আর আসার সাহস করবে না,' ধীরে সুস্থে মাসকেটে গুলি ভরছে সে।

দাঁত বের করে হাসল কিশোর, বারুদের ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে গেছে মুখ। 'হ্যাঁ, আর ছেলেমানুষ ভাববে না আমাদেরকে। ওমরভাই, কি মনে হয়? আবার আসবে?'

'আসবে তো বটেই। মরার আগে হাল ছাড়বে না হ্যামার। সব রকমে চেষ্টা করে দেখবে। আক্রমণ করে না পারলে, খাবার আর পানি আটকে দেবে। তখন আর কোন উপায় থাকবে না আমাদের, ওর কথা শুনতে বাধ্য হব।'

'সে-তো অনেক পরের কথা, খাবার ফুরোলে তবে তো,' এতক্ষণে খাবার কথা মনে পড়ল মুসার। 'এখুনি সুযোগ, গোটা কয়েক নারকেল ভাঙলে কেমন হয়?'

রাইফেল গর্জে উঠল, একটা বুলেট এসে লাগল পাথরে, বিইঙঙ করে পিছলে বেরিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা।

'অসতর্ক হলে কি হবে বুঝলে তো?' ভুরু নাচাল ওমর। 'তখনও বোকামি করেছ দেখেছি, কয়েকবার দাঁড়িয়ে উঠেছ। ওরা ঠিকমত গুলি চালাতে পারলে তোমার নিজের নারকেলই ভেঙে পড়ে থাকত এতক্ষণে। খবরদার, আর কক্ষনো মাথা তুলবে না।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো ববের। বোকার মত বলল, 'আমাদেরকে গুলি করছে?'

'তো কাকে? পাথরে হাত সই করছে? পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে

আমাদের দেখলেই গুলি ছুঁড়বে। মনে হচ্ছে, এইই করবে ওরা আপাতত। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে কিছু মুখে দিয়ে এসো। আমি পাহারায় থাকছি। তোমরা এলে আমি যাব।'

বিকেল গড়িয়ে গেছে। ছেলেরা যখন ফিরে এল, পশ্চিমে হেলে পড়েছে তখন সূর্য। শত্রুদের দেখা যাচ্ছে না, তবে মাঝেমধ্যে একআধটা বুলেট ছুটে এসে আঘাত হানছে পাথরের দেয়ালে। কারও কোন ক্ষতি করতে পারছে না। এটা বোঝা যাচ্ছে, দুর্গের দিকে কড়া নজর রেখেছে শত্রুরা।

রাত নামল। চার জন সৈন্য ছুটে এল উল্টানো নৌকাটার দিকে। তারার আলোয় তাদের আবছা মূর্তি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল অভিযাত্রীরা। যেমন এসেছিল, তেমনি তাড়াহুড়ো করে আবার ফিরে গেল সৈন্যরা।

রাত গভীর হলো। সৈন্যদের সাড়া নেই আর। কাউকে দেখা গেল না।

'কড়া পাহারা দিতে হবে আজ রাতে,' ওমর বলল সঙ্গীদেরকে। 'ঘুমোতে হবে এখানে শুয়েই। বব, আজও দ্বীপে যাবে নাকি?'

'মাথা খারাপ!' জোরে মাথা নাড়ল বব।

নয়

ভোর হলো। ববের এখন ডিউটি। সাগরের ওপর হালকা কুয়াশা, ধোঁয়ার চাদর ঢেকে রেখেছে যেন দ্বীপটাকে। সূর্য উঠল। এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে গেল ঝুলে থাকা কুয়াশা। চেঁচিয়ে উঠল বব তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে, 'এই, তোমরা জলদি এসো! ওমরভাই! জলদি আসুন।'

ছুটে এসে উঠল সবাই ছাতে।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল ওমর।

খোলা সাগরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বব। আয়নার মত সমতল সাগর, কাঁচা রোদে চিকচিক করছে। তাতে ঢেউ তুলে আস্তে আস্তে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে ট্রলারটা, আগের দিন যেটাকে ল্যাগুনের কাছে দেখা গিয়েছিল। গলুইয়ের নিচে পানি ছিটকে পড়ছে দু'দিকে, পানির ছোট ছোট কণাগুলোতে রোদ লাগায় মনে হচ্ছে হীরের টুকরো। শিল্পীর তুলিতে আঁকা যেন এক অপরূপ ছবি, কিন্তু ওমরের তা মনে হচ্ছে না। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছে সুন্দর জাহাজটা।

'তাহলে এই ব্যাপার,' বিড়বিড় করল ওমর। 'জাহাজ থেকে আক্রমণ চালাবে।'

'সারেঙ ছাড়া তো আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর।

'নিশ্চয় নিচে রয়েছে, যাতে গুলি না করতে পারি আমরা। থাকুক। সুইডেল-গানটার কথা জেনে গেছে ওরা, কিন্তু কামানের কথা জানে না এখনও। সই করে দু'একটা গোলা জাহাজে ফেলতে পারলেই কাঁপিয়ে দিতে পারব। শোনো,' ভারি হলো ওমরের কণ্ঠ, 'এ-যাবৎ ডাকাত-ডাকাত খেলা খেলে এসেছি, কিন্তু এটা খেলা নয়! প্রাণপণে লড়তে হবে এবার। হ্যামারের হাতে পড়া চলবে না। তার

শয়তানীর সাক্ষী আমরা, তাকে খুন করতে দেখেছি। সাক্ষী বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে না সে কিছুতেই। এসো, হাত লাগাও।' বক্তৃতা শেষ করল সে। কোমরের পিস্তল খুলে নিয়ে তাতে বারুদ আর গুলি ভরল। 'চলো, কামানের মুখ ঠিক করে রাখি।'

কামানের মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে ববের মনে হলো, তিনশো বছর পিছিয়ে গেছে সে, রক্তে লড়াইয়ের উন্মাদনা। নিজের অজান্তেই নিজেকে জলদস্যু ভাবতে শুরু করেছে।

'আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে গতকাল,' বলল ওমর, 'দেখছ, কেমন লুকিয়ে আছে? কারও ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।'

'এসব কামানের রেঞ্জ কত, বলতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল ওমর। 'এত পুরানো জিনিস ছুঁয়েও দেখিনি কোন দিন।

'জাহাজ সই করে দিন না তাহলে মেরে। কত দূরে যায়, এক গোলাতেই বুঝে যাব।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল ওমর। 'সরো, আমি গোলা ছোঁড়ার সময় কাছে থাকবে না। কি পরিমাণ ঝাঁকি দেবে কে জানে। পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠলেও অবাক হব না।' একটা কামানের পেছনে বসে পড়ল ওমর। আগের দিনই গোলা ভরে রেখেছে। 'আগুন, কিশোর, জলদি।' কামানের মুখ সামান্য সরিয়ে জাহাজের দিকে নিশানা করল।

কম্বল ছিঁড়ে সলতে বানানোই আছে। একটাতে আগুন ধরিয়ে এগিয়ে এল কিশোর। 'ওমরভাই, দিন না, পয়লাটা আমিই করি। কিভাবে করতে হবে শুধু দেখিয়ে দিন।'

কিশোরের দিকে চেয়ে কি ভাবল ওমর, সে-ই জানে। হাসি ফুটল মুখে। 'বেশ, তবে খুব সাবধান। ওই ভোজালিটা আনো। ওটার মাথায় সলতে রেখে লাগিয়ে দাও বারুদে। দিয়েই সরে যাবে এক পাশে।'

তৈরি হলো কিশোর।

'ফায়ার!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল ওমর।

কামানের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোল কমলা আগুন, পেছনে ঘনকালো ধোঁয়ার মেঘ, বাজ পড়ল যেন ঠিক কানের কাছে, এত প্রচণ্ড শব্দ। দ্বীপের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে আওয়াজ। জাহাজটা এখন কোয়ার্টার মাইল দূরে, ওটার পেছনে পানিতে পড়ল গোলা, চারিদিকে ছিটকে উঠল পানি।

'গেছিল,' কামান ছুঁড়তে পারার আনন্দে ধেই ধেই করে এক পাক নেচে নিল কিশোর। 'আরেকটু হলেই লেগে গিয়েছিল। ওমরভাই, কামানের মুখ সামান্য নামিয়ে দিন, পরের বারেই লাগিয়ে দেব।'

মুসা আর ববকে খালি কামানে আবার গোলা-বারুদ ভরার নির্দেশ দিয়ে পাশের কামানটার কাছে বসল ওমর। দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। কিশোরকে আগুন আনতে বলে সরে গেল।

'ফায়ার!' আবার আদেশ দিল ওমর।

'বুম্‌ম্!'

আবার কমলা আগুন ছুটে গেল জাহাজের দিকে। এবার আর মিস হলো না। ট্রলারের পেছনে কাঠ ভাঙার শব্দ হলো, শূন্যে লাফিয়ে উঠল কাঠের চিলতে।

'লাগিয়েছি! লাগিয়েছি!' আবার নাচতে শুরু করল কিশোর, সেই সঙ্গে হাততালি।

'এতে চলবে না,' ওমর সন্তুষ্ট নয়। 'ইঞ্জিনরুমে ঢোকাতে হবে, কিংবা পাশে এমন জায়গায় ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে পানি ঢোকে। দেখি, এসো।' আরেকটা কামানের কাছে এসে বসল সে।

প্রথমটায় গোলা-বারুদ ভরে ফেলেছে বব আর মুসা, দ্বিতীয়টায় ভরতে লেগে গেল। এ-কাজে ওস্তাদ হয়ে গেছে দু'জনে।

কামানের নিশানা ঠিক করল ওমর, তিনটেরই। মুসা আর ববকেও কামান দাগার জন্যে তৈরি হতে বলল।

তিনজনেই তৈরি।

আবার আদেশ দিল ওমর, 'রেডি। ফায়ার!'

কামানের গর্জনে কেঁপে উঠল পাথরের দুর্গ, কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কালো ধোঁয়া ঢেকে দিল সামনেটা, জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। দেখার অপেক্ষা করলও না ওরা, দ্রুতহাতে গোলা-বারুদ ভরতে শুরু করল আবার।

কালো ধোঁয়া সরে গেছে। জাহাজের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল তিন কিশোর, একই সঙ্গে। আনন্দে লাফাচ্ছে।

'মাস্তুল গেছে,' বলল বব।

ঠিকই বলেছে। মাস্তুল ভেঙে পড়েছে সামনে ডান পাশে। আগের দিনের পালের জাহাজ হলে থেমেই যেত, কিন্তু আধুনিক ট্রলার ইঞ্জিনে চলে। থামল না, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রাখতেও পারল না, জাহাজের নাক সোজা রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সারেঙ। কেন গোলমাল হচ্ছে, বুঝতে পারছে জাহাজের লোকেরাও, তিনজন কুড়াল হাতে এসে কোপাতে শুরু করল। মাস্তুলের গোড়ার দিকটা পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি, সেটা কেটে পানিতে ফেলে দেবে মাস্তুলটা। আরও ক্ষতি হয়েছে জাহাজের, মূল কাঠামোর এক জায়গায় লেগেছে আরেকটা গোলা, ভেঙে গেছে। মাস্তুলের ভারে এক পাশে বিশ্রীভাবে কাত হয়ে গেছে ট্রলার।

'মাসকেট!' গর্জে উঠল ওমর। 'যারা মাস্তুল কাটছে, খতম করে দাও। হাল কাজ করছে না মনে হচ্ছে, মাস্তুলটা সরাতে না পারলে করবেও না।'

একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেল চারজনে। কার গুলি লেগে, বোঝা গেল না, পড়ে গেল তিনজনের একজন। আরেকজন পালাল। তৃতীয়জন বড় বেশি দুঃসাহসী, মারাত্মক গুলি উপেক্ষা করে কুপিয়ে চলল।

মাসকেট ফেলে দিয়ে সুইভেল-গানের মুখ ঘোরাল ওমর। গুলি করল।

ভয়ানক ক্ষতি করল বলের ঝাঁক, কাঠের চিলতের ঝড় উঠল ডেকের একটা অংশে। তৃতীয় লোকটাও পড়ে গেল। কিন্তু দুই এক গড়ান দিয়েই আবার উঠে পড়ল, মরেনি, আহত হয়েছে। ক্রল করে চলে গেল আড়ালে।

আজ দ্বিতীয় দফা অবাক হলো ওমর সুইভেল-গানের প্রচণ্ড ধ্বংস-ক্ষমতা

দেখে। 'বাপরে বাপ, শেলের চেয়ে খারাপ!' বিড়বিড় করল সে।

'ট্রলারের বারোটা বেজেছে,' বলল মুসা।

জাহাজের গতিপথ ঠিক নেই, ইঞ্জিন চালু রয়েছে এখনও, কিন্তু নাক ঘুরে গেছে আরেকদিকে। দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই সারেঙের, বসে পড়েছে, সেই অবস্থায়ই জাহাজ সামলানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে, পারছে না।

'কামান দাগতে থাকো,' কিশোর আর মুসাকে আদেশ দিল ওমর। 'আমার বলার জন্যে বসে থেকো না। গোলা ভরো আর ছাড়ো। বব, মাসকেটগুলো ভরো তুমি।'

একের পর এক গোলা ছুটল। সুইভেল-গান থেকে গুলি ছুঁড়ছে ওমর। গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে জাহাজের গা, চামড়া ক্ষত করে দিচ্ছে সুইভেল-গানের বল। জাহাজের ডেকে আর পানিতে কাঠের চিলতের ছড়াছড়ি। কিন্তু চেষ্টা করেও সারেঙের গায়ে লাগানো যাচ্ছে না, লোকটার ভাগ্য ভাল। নিরস্তও হচ্ছে না সে। এত গোলাগুলির মাঝেও হাল ছাড়ছে না। নড়াচড়ায় মাস্তুলটা আপনা-আপনি গড়িয়ে পড়ে গেছে পানিতে। ফলে জাহাজের নাক সোজা করে ফেলেছে আবার সারেঙ, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওমর। আরেকটু এগোলেই কামানের রেঞ্জের এপাশে চলে আসবে জাহাজ। নোয়াতে নোয়াতে একেবারে চত্বরের সঙ্গে লেগে গেছে নলের মুখ, আর নামানো যাবে না। কোনমতে সিঁড়ির কাছাকাছি জাহাজ আনতে পারলে আর ঠেকানো যাবে না সৈন্যদেরকে, দরকার হলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে আসবে, তারপর উঠে আসবে সিঁড়ি বেয়ে।

তবে, এখনই সব চেয়ে বড় সুযোগ। কামানের আওতায় রয়েছে জাহাজ, খুবই কাছে। কোনমতে একটা গোলা ডেক পার করে যদি ইঞ্জিন রুমে ঢুকিয়ে দেয়া যায়, ব্যস, হয়ে গেল কাজ। ইঞ্জিন তো যাবেই, ডেকে লুকিয়ে থাকা সৈন্যও মরবে বেশ কিছু।

হঠাৎ ডেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল সৈন্যরা। তাদের মাঝে রয়েছে হ্যামার, চেঁচিয়ে সাহস দিচ্ছে সবাইকে, গুলি করতে বলছে।

গুলি শুরু করল সৈন্যরা।

ঘামে ভিজে সপসপ করছে ওমরের গা। টেনে ছিঁড়ে গা থেকে শার্টটা খুলে ফেলে দিল। মরিয়া হয়ে উঠেছে বেদুইন। কিছুতেই পরাজয় বরণ করবে না, যে করে হোক ঠেকাবেই দুশমনকে। 'মাথা নোয়াও, নুইয়ে রাখো!' চেঁচিয়ে বলল সে।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগছে পেছনের দেয়ালে, কোনটা খসে পড়ছে চত্বরে, কোনটা পিছলে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে। মারাত্মক।

সুইভেল-গানটা, সরিয়ে আরেকটু সামনে নিয়ে এল ওমর। ডেক সই করে ছাড়ল আরেক ঝাঁক গুলি। সুইভেল-গান ব্যবহার শেষ, আর নাগাল পাবে না জাহাজের। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ডেক, দু'জন সৈন্য পড়ে গেল, কিন্তু ইঞ্জিন আগের মতই সচল।

মরিয়া হয়ে উঠেছে তিন কিশোরও। মাসকেট তুলে সারেঙকে লক্ষ্য করে গুলি

করল কিশোর। নিশানা ভাল না, সারেঙের মাথার ওপর দিয়ে গেল গুলি। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল লোকটা। ববের দিকে বন্দুকটা ছুঁড়ে দিয়ে গুলিভর্তি আরেকটা তুলে নিল কিশোর। আবার গুলি করল সারেঙকে। আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেল লোকটা, আস্তে আস্তে উঠল আবার। এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে রেখেছে, বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে আহত হাতটা। যাক, একটা গুলি অন্তত খেয়েছে।

সুইভেল-গানে গুলি বর্ষণের পর পরই শূন্য হয়ে গেছে ডেক, আবার নিচে গিয়ে লুকিয়েছে সবাই।

'থামো,' আদেশ দিল ওমর। 'আন্দাজে গুলি করো না আর। ভালমত দেখে নিশানা করে তবে। ব্যাটারা বেরোক।'

কিন্তু আর বেরোল না কেউ।

কাছে চলে আসছে ট্রলার, শিগগিরই ঘাটে লাগবে। এখুনি কিছু একটা করতে না পারলে আর সময় পাওয়া যাবে না।

টেনেহিঁচড়ে একটা কামানকে একেবারে কিনারে নিয়ে এল ওমর, তাকে সাহায্য করল অন্য তিনজন। জাহাজটা এসে চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিল ঘাটে বাঁধা নৌকাকে। চত্বরের এক জায়গায় নিচু দেয়াল, ছাতে যেমন আছে, মাঝে মাঝে ফোকর। দেয়ালের নিচেই এখন জাহাজটা। ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না অন্যেরা। কোন ফোকরে ঢুকিয়েই এখন কামান দাগা যাবে না। তাহলে?

কামানের নল কোন ফোকরে ঢোকাল না ওমর, দেয়াল সই করে দিল বারুদে আগুন ধরিয়ে। বিস্ফোরণের গরম ঝাপটা যেন ছ্যাঁকা দিয়ে গেল অভিযাত্রীদের, কালো ধোঁয়া ঢেকে দিল সামনেটা। ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল, দেয়ালের বড় একটা অংশ ধসে গিয়ে পড়েছে জাহাজের ডেকে। চেঁচামেচি আর গোঙানিতে ভরে গেছে বাতাস, মাঝে মাঝে রাইফেল গর্জে উঠছে, পাথরে বাড়ি খেয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট।

লড়াইয়ের উন্মাদনায় পাগল হয়ে উঠেছে বব, তার জীবনে এত উত্তেজনা আর কখনও আসেনি। উল্লাসে চেঁচাচ্ছে সে।

ভাঙা দেয়ালটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে কিশোর। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ওমরভাই, আসুন!'

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল ওমর, সে নিজেও একই কথা ভাবছিল। অন্য দু'জনকে ডেকে বলল সাহায্য করতে।

'হেঁইও, হেঁইও,' করে ধাক্কা দিয়ে কামানটাকে ঠেলে দিল ওরা চত্বরের বাইরে।

ক্ষণিকের জন্যে বাতাসে ঝুলে রইল ভারি লোহার তাল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেল নিচে। পড়ল গিয়ে জাহাজের ডেকে। ঠেকাতে পারল না ডেক এত ভারি একটা জিনিস, ভোঁতা শব্দ তুলে ছিঁড়ে গেল, যেন তুলোট কাগজ, মস্ত কালো ফোকর সৃষ্টি করে ডেকের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল কামানটা। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল জাহাজ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনা ছয়েক লোক নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল হ্যামার। খৈ ফুটছে তার মুখে, বিচ্ছিরি সব গাল দিয়ে চলেছে অনর্গল। সৈন্যদেরকে নিয়ে সিঁড়িতে উঠে পড়ল সে।

'মাসকেট!' চেঁচিয়ে উঠল ওমর। থাবা দিয়ে তুলে নিল হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা বন্দুক। হ্যামারকে সই করে দিল ট্রিগার টিপে। গুলি ফুটল না। বারুদ ভরা হয়নি বোধহয় ঠিকমত।

এই সুযোগে সিঁড়ির আধাআধি উঠে চলে এল হ্যামার, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কুৎসিত ভঙ্গিতে—মুখব্যাদান করে রেখেছে যেন একটা জানোয়ার, হাতে রিভলভার।

বন্দুকটা ছুঁড়ে মারল ওমর। হ্যামারের হাতে বাড়ি লেগে রিভলভারটা উড়ে গিয়ে পড়ল পানিতে।

থামল না হ্যামার। গাল দিয়ে উঠে এক টানে ছুরি বের করল। দুপদাপ করে লাফিয়ে উঠে আসছে।

সাংঘাতিক একটা মুহূর্ত। কি ঘটে কি ঘটে! এদিক ওদিক তাকাল ওমর, একটা পিস্তল দেখে ছোঁ মেরে তুলেই গুলি চালাল। তাড়াহুড়োয় গুলি লাগাতে পারল না হ্যামারের গায়ে, কিন্তু একেবারে মিস হলো না, তার পেছনের লোকটা আর্তনাদ করে উল্টে পড়ে গেল।

এবার? এবার কি হবে?

ওমরের কানের কাছে গর্জে উঠল পিস্তল, পলকের জন্যে বধির হয়ে গেল সে। এবারও হ্যামারের গায়ে লাগল না, তার পেছনের আরেকটা লোক উল্টে পড়ল, তার ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ল আরেকজন।

ফিরেও তাকাল না হ্যামার, উঠে এল ওপরে, তার প্রায় গায়ে গা ঘেঁষেই এল আর দু'জন।

যে কোন একটা অস্ত্রের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ওমর। কামানে আগুন দিয়েছিল যে ভোজালিটা দিয়ে কিশোর, সেটা চোখে পড়তেই তুলে নিতে ছুটল, কিন্তু ধাড়ুম করে উপুড় হয়ে পড়ল একটা পাথরে পা বেধে। বনবেড়ালের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যামার।

এঁকেবেঁকে পিছলে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওমর, পারল না, তার বুকের ওপর চেপে বসল হ্যামার। রোদে ঝিক করে উঠল তার হাতের ছুরির তীক্ষ্ণ ধার ফলা। দাঁত বের করে কুৎসিত হাসি হাসল ডাকাতটা, ওমরের গলার ওপর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে ছুরি, জবাই করবে।

গর্জে উঠল পিস্তল। স্থির হয়ে গেল হ্যামারের হাত, খসে পড়ল ছুরি, ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে এক পাশে টলে পড়তে শুরু করল সে নিজেও। স্লো মোশন ছায়াছবির মত ঘটছে ঘটনা।

ধাক্কা দিয়ে হ্যামারকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে উঠে বসল ওমর। ফিরে চেয়ে দেখল, দু'হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে কাঁপছে কিশোর, নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছাই হয়ে গেছে মুখ।

'থ্যাংকিউ, কিশোর,' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল ওমর। পরক্ষণেই ভোজালিটা

তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে হ্যামারের সঙ্গীসাথীরা। ওমরকে ভোজালি হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেল। আক্রমণ আর করল না, নেতার পতন ঘটার পর সাহস আর মনের জোর দুইই হারিয়েছে ওরা। অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওপর থেকেই ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ল সাগরে। ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেল জাহাজীরাও, বিধ্বস্ত জাহাজটাকে সরিয়ে নিতে শুরু করল। ধুম্‌ম্ ধুম্‌ম্ করে গুলি চালাল মুসা আর বব।

'ব্যস, হয়েছে,' হাত তুলল ওমর। 'গুলি থামাও।'

দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে আছে কিশোর। চুল উসকোখুসকো। হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। পিস্তলটা পড়ে আছে এক পাশে।

মুসার চোখ লাল, ধপ করে বসে পড়ল। আস্তিন দিয়ে রক্ত মুছল গালের একটা কাটা থেকে।

বব যেন নিষ্প্রাণ একটা পুতুল, শূন্য চোখে চেয়ে আছে ট্রলারটার দিকে।

'বেশি কেটেছে?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'নাহ্,' দুর্বল কণ্ঠে বলল মুসা। 'একটা গুলি পাথরে বাড়ি খেয়ে এসে লেগেছিল।'

জাহাজটার দিকে ফিরে চাইল ওমর, পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে নাক ঘোরাচ্ছে তীরের দিকে। 'শিক্ষা হয়েছে ব্যাটাদের।' একটা ডাব এনে ভোজালি দিয়ে কেটে মুসার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'নাও, খেয়ে নাও, ভাল লাগবে।'

'এক ডাবে কি হবে এক বালতি পানি দরকার,' ডাবটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'এত পিপাসা জীবনে লাগেনি। নৌকাটা কোথায়?'

'আমাদেরটা? ডুবে গেছে। ধাক্কা দিয়ে চ্যাপ্টা করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহাজটা তীরের দিকে যাচ্ছে, পানি উঠছে হয়তো। উঠুক আর না উঠুক, আজ আর আসছে না। ...মাথা অত উঁচিও না, নোয়াও, গুলি করে বসতে পারে।...আচ্ছা, সিডনি বারডুকে দেখলাম না-তো। তোমরা দেখেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

বব আর মুসা জানাল, ওরাও দেখেনি।

'প্লেনটা দখল করতে না পারলে লাভ হবে না কিছু,' চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। ছাতে উঠল গিয়ে। ল্যাগুনে বিমানটা আছে কিনা দেখবে। সাগরের দিকে একটা নড়াচড়া দৃষ্টিগোচর হতেই ঝট করে ঘুরল ভালমত দেখার জন্যে। 'হায় আল্লাহ্!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

আরও বিপদ আসছে মনে করে ছাতে উঠে এল অন্যেরা। বড় জোর মাইল খানেক দূরে, দ্বীপের দিকে মুখ করে ছুটে আসছে লম্বা একটা বড় জাহাজ।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল বব। 'ডেস্ট্রয়ার। ওটা হামলা চালালে আর ঠেকাতে পারব না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে হঠাৎ হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'না না, আক্রমণ করবে না। আমেরিকান। নেভির শিপ, বুঝতে পারছ না?...কিন্তু এখানে

এল কেন? জলদস্যুতা শেষ হয়ে গেছে অনেক বছর আগে, টহল দিচ্ছে না জাহাজটা। দেখি, কি করে।'

'ইস্, যদি আমাদের তুলে নিত,' বলল মুসা। 'এক প্লেট ডিম ভাজা আর রুটি যদি খেতে দিত, আর কিছু পনির, একটা মুরগী, কলা…'

'বোলো না আর,' দু'হাত নাড়ল বব, 'বোলো না।'

ববের কথার ধরনে হেসে ফেলল সবাই। জানে, বিপদ পুরোপুরি কাটেনি এখনও, দোদুল্যমান অবস্থা, কিন্তু জাহাজটা দেখে হালকা হয়ে গেছে সবার মন। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওটা শত্রুপক্ষের নয়।

'কোনভাবে জানাতে পারি না, আমরা এখানে আছি?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'হ্যাঁ, ঠিক,' সায় দিল ওমর। 'এসো, চেঁচাই সবাই মিলে…'

এক সঙ্গে জোরে চিৎকার করে ডাকল ওরা, কিন্তু কোন সাড়া এল না।

'কালা নাকি সব?' গোঁ গোঁ করল মুসা। ডিম ভাজার চিন্তায় বিমর্ষ। 'আবার ডাকি?'

চিৎকার করে আবার ডাকল ওরা। সাড়া মিলল না এবারেও। তবে থামতে শুরু করল ড্রেস্ট্রয়ার। বোট নামাল। ঝিলিক দিয়ে উঠল ছয় জোড়া ভেজা দাঁড়, দ্রুত গতিতে ছুটে এল নৌকাটা উপদ্বীপের দিকে। গলুইয়ের কাছে বসে আছে শাদা পোশাক পরা একজন অফিসার।

ছাদ থেকে চত্বরে নেমে এল অভিযাত্রীরা। ছুটে এসে দাঁড়াল ভাঙা নিচু দেয়ালের ধারে। নৌকা কাছে আসতেই ডেকে বলল ওমর, 'ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন। সিঁড়ি আছে।'

স্পষ্ট আদেশ শোনা গেল। উপদ্বীপের এক পাশ ঘুরে সিঁড়ির কাছে এসে থামল নৌকা। পানিতে ভাসছে খানিক আগের খণ্ডযুদ্ধের আলামত। অবাক হয়ে দেখছে অফিসার। অভিযাত্রীদের দিকে চেয়ে হাসল কয়েকজন নাবিক।

হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে চত্বরে উঠে এল অফিসার। আদিম কামান-বন্দুকগুলোর দিকে চেয়ে থমকে গেল। একে একে তাকাল চারটে বারুদে-মাখামাখি শরীরের দিকে। 'কি ব্যাপার? ডাকাত পড়েছিল নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ওমর। 'আরেকটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে। অনেক কষ্টে বেঁচেছি। লড়াই করে।'

'এগুলো দিয়ে?'

'খেলনা ভাবছেন নাকি? একেকটা গোলা যে কাণ্ড করেছে, যদি দেখতেন…সুইভেল-গানটার কথা বাদই দিলাম।'

কালো পতাকাটার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকালো লেফটেন্যান্ট। 'জলদস্যু?'

'আধুনিক জলদস্যু।'

'আপনারা?'

'আমরা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের গুপ্তধন-সন্ধানী,' পরিবেশ হালকা করার জন্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল ওমর। 'ধরে নিন, আমি ক্যাপ্টেন স্মলেট। আর এই যে

ইনি স্কয়ার ট্রেলনী, ইনি ডক্টর লিভসী, আর ও জিম হকিনস। আর এই যে,' বাঁকা হয়ে পড়ে থাকা হ্যামারের লাশটা দেখাল, 'এ হলো লঙ জন সিলভার।'

'মারা গেছে?'

'উপায় ছিল না। না মারলে আমরা মরতাম।'

আদিম কামান-বন্দুক, জলদস্যুর কালো পতাকা, অভিযাত্রীদের পোশাক-আশাক আর অবস্থা দেখে বোকা হয়ে গেছে যেন অফিসার, ব্যাপারটাকে কি ভাবে নেবে বুঝতে পারছে না। তবে তার হাবভাবে মনে হলো, অভিযাত্রীদের পাগল ভাবছে সে। 'তা গুপ্তধন মিলল?'

'নিশ্চয়ই। নইলে এত খুনখারাপী কেন?' মোহরের স্তূপ দেখাল ওমর। 'ওই যে। চাইলে দু'একটা নিতেও পারেন, স্যুভনির রাখবেন।'

হাঁ হয়ে গেল অফিসার। এগোবে কিনা ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল হ্যামারের পাশে পড়ে থাকা একটা মোহরের দিকে। নিচু হয়ে সেটা তুলতে গেল।

হাঁ-হাঁ করে উঠল ওমর। 'ওটা না ওটা না। নিলে মরবেন।' লাফিয়ে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। চকিতের জন্যে সোনালি একটা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে গেল ডাবলুনটা, পড়ল পানিতে। হারিয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'অভিশপ্ত। অনেক মানুষের প্রাণ নিয়েছে।'

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'চলুন, জাহাজে চলুন। ক্যাপ্টেনকে সব খুলে বলবেন।'

'খুব ভাল কথা, চলুন,' খুশি হলো ওমর।

অফিসারের পিছু পিছু নেমে এল ওরা বোটে।

দশ

'ভাগ্য ভাল আমাদের, আপনারা এসেছেন,' লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল ওমর। 'কেন এসেছিলেন?'

হাসল অফিসার। 'কেন? যে কাণ্ড করেছেন আপনারা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অর্ধেকটা কাঁপিয়ে দিয়েছেন। বিশ মাইল দূর থেকে গোলার আওয়াজ শুনেছি, কালো ধোঁয়া দেখেছি। আমরা তো ভাবছিলাম, দ্বীপপুঞ্জগুলো যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। এরপরেও দেখতে আসব না?'

'অ।' হাসল ওমর। জাহাজের কাছে চলে এসেছে বোট। রেলিঙে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৌতূহলী দর্শক, তাদের দিকে তাকাল সে।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল বব। ফিরে চেয়ে দেখল ওমর, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ববের। ফেকাসে চেহারা।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল ওমর। 'ব্যথা লেগেছে কোথাও?'

'না, কিছু না,' মাথা নাড়ল বব।

'কিছু তো বটেই। কি?'

'মনে হলো···মনে হলো, বাবাকে দেখলাম! ডেকে,' নিচু গলায় বলল সে।'

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে রেলিঙের কাছে দর্শকদের দেখল আরেকবার ওমর। 'কই,

কোথায়?'

ববের কথা অফিসারের কানেও গেছে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ববের দিকে। 'তুমি কলিনস না তো?'

'হ্যাঁ, কলিনস, বব কলিনস,' অবাক হলো বব, তার নাম জানল কি করে লোকটা?'

'তাহলে ঠিকই দেখেছ,' মাথা কাত করল লেফটেন্যান্ট। 'তোমার বাবা-ই। এক বন্দরে আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন তাকে আগে থেকেই চিনতেন। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল কলিনস, গুপ্তধনের গল্প। সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করল ক্যাপ্টেনকে। এমনভাবে বলল, যাচাই করে দেখতে রাজি হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, তাছাড়া এদিক দিয়েই যাওয়ার কথা আমাদের। কলিনসকে জাহাজে তুলে নিলেন তিনি।'

কিন্তু ববের কানে অফিসারের কথা ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। রেলিঙের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। আরেকজন মধ্যবয়েসী দর্শক এসে দাঁড়িয়েছে, ববের মতই চুলের রঙ, একজন সিভিলিয়ান।

জাহাজের গা ছুঁল বোট। সিঁড়ি নামানো হলো। কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেল বব। সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিভিলিয়ান লোকটার বাড়ানো দুই হাতের মাঝে।

উঠে গেল ওমর, কিশোর আর মুসা। বব আর তার বাবার তখন মুখে হাসি, চোখে পানি। দর্শকরা ঘিরে ধরল অভিযাত্রীদেরকে।

'সাড়া ফেলে দিয়েছি মনে হচ্ছে,' কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল ওমর।

মাথা ঝোঁকাল শুধু কিশোর।

জাহাজের পেছন দিকে ডেকে একটা কাঠের সামিয়ানার তলায় অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন। অভিযাত্রীদের তাঁর কাছে নিয়ে এল লেফটেন্যান্ট, পেছন পেছন এল কৌতূহলী দর্শকের দল।

ক্যাপ্টেনের বয়েস অল্প, তরুণ। বিচিত্র পোশাক পরা অভিযাত্রীদের দেখে একই সঙ্গে কৌতূহল, সন্দেহ আর বিস্ময় ফুটল তাঁর চোখে। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন তাদেরকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'দলপতি কে?'

'ইনি,' ওমরকে দেখিয়ে দিল কিশোর।

'কি হয়েছিল?' আবার প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'সবই বলব,' ওমর বলল, 'কিন্তু তার আগে পানি খাওয়ান আমাদের। গোসলও করতে হবে। হাতমুখের যা অবস্থা।' হাসল সে।

পানি আনতে বললেন ক্যাপ্টেন। 'আর?'

'দ্বীপের ধারে একটা ল্যাগুনে আমাদের প্লেন আছে, শত্রুরা দখল করে নিয়েছে, ওটা ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠান, প্লীজ। আর আপনার লেফটেন্যান্ট সাহেব আমাদেরকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, অনেক মোহর আছে ওখানে, ওগুলোও আনা দরকার। তাড়াতাড়ি না করলে লুট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিছু ডাকাত

দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। মোহর নিয়ে প্লেনে করে পালাতে পারে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওমরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। 'তার মানে, বলতে চাইছেন সত্যিই গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?'

'একটা দুটো নয়, হাজার হাজার।'

'তাই?'

'বলেছিলাম না, স্যার, মোহর আছে, অনেক মোহর,' বলে উঠল ববের বাবা।

'শুধু মোহর না,' ওমর বলল, 'আরও অনেক মূল্যবান জিনিস আছে দ্বীপে।'

'নিশ্চয় গ্যালিয়নটা খুঁজে পেয়েছেন আপনারা? কলিনস যেটার কথা বলছিল?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে গেলে দেখাতেও পারি। কিন্তু আগে আমাদের পানি আর খাওয়া...'

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে ঠাণ্ডা হয়ে নিন, তারপর বলবেন সব কিছু। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি দ্বীপে।'

গায়ে সাবান মাখতে মাখতে বাবার সঙ্গে কথা বলছে বব। জানা গেল, হ্যামারের ছুরি খেয়ে সেদিন মরেনি কলিনস, দমটা ছিল কোনমতে। যমে-মানুষে টানাহেঁচড়া করে শেষে ডাক্তাররা বাঁচিয়েছে তাকে। অনেক সময় লেগেছে সুস্থ হতে। ভাল হয়েই আরেকটা চিঠি লিখেছে ববের কাছে, কিন্তু পায়নি বব, সে তখন বেরিয়ে পড়েছে গুপ্তধনের সন্ধানে। জ্যামাইকার কিংসটন বন্দরে চলে গেছে এরপর কলিনস, ওখানেই দেখা ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। প্রাচীন গ্যালিয়ন আর মোহরের কথা কৌতূহলী করে তুলেছে তরুণ ক্যাপ্টেনকে। বিশ্বাস করার আরও কারণ ছিল, কলিনস যে এলাকার কথা বলেছে, ওখানে আগেও কয়েকটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাছাড়া ওই এলাকাটা এককালে ছিল জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য। ভেবেচিন্তে শেষে কলিনসকে জাহাজে তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন।

জানা গেল, মাত্র আগের দিন বিকেলে বেতারে একটা মেসেজ পেয়েছেন ক্যাপ্টেন, ম্যারাবিনার প্যান-আমেরিকান রেডিও স্টেশন মেসেজটা পাঠিয়েছে, চারজন আমেরিকানকে নিয়ে একটা বিমান নিখোঁজ হয়েছে দক্ষিণ সাগরের কোথাও। গুপ্তধন নয়, বিমানটাকেই খুঁজছিল ডেস্ট্রয়ার। কামানের গোলার শব্দ কানে আসতেই দ্রুত গতিতে ছুটে এসেছে খোঁজ নিতে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে বব আর ববের বাবা, দু'জনের কেউ কাউকে আশা করেনি এখানে।

এক ঘণ্টা পর। বেশ ভাল একটা ভূরিভোজন শেষে চার অভিযাত্রীকে আবার নিয়ে আসা হলো সামিয়ানার নিচে। সিকরস্কিটাকে উদ্ধার করে এনে ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। মৃদু ঢেউয়ে দুলছে ওটা স্বচ্ছ নীল পানিতে। ক্যাপ্টেনের চেয়ারের পাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে মোহর।

চেয়ারে বসল অভিযাত্রীরা।

ওমরকে বললেন ক্যাপ্টেন, 'এবার শুরু করুন আপনার কাহিনী। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, খুলেই বলুন সব।'

কফির কাপ টেনে নিল ওমর। তারপর শুরু করল গল্প। একেবারে গোড়া থেকে, কিছুই গোপন করল না, মাঝে মাঝে কথা যোগ করল তিন কিশোর। রুদ্ধশ্বাসে

শুনলেন ক্যাপ্টেন আর তাঁর অফিসারেরা।

'অবিশ্বাস্য,' ওমরের কথা শেষ হলে বললেন ক্যাপ্টেন। 'চোখের সামনে প্রমাণ রয়েছে, তা-ও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।...তো, আপনাদের এখন কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে?'

'দেশে।'

'হ্যাঁ, তাই যেতে হবে। আপনাদেরকে ছাড়তে পারছি না এখন, সরি, যেতে হবে আমাদের সঙ্গেই। একটা কোর্ট অভ ইনকয়্যারী হবে, তারপর আদালত থেকে যা রায় হয়, হবে। হাজার হোক, মানুষ খুন করেছেন আপনারা।'

'কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে করেছি। আর কোন উপায় ছিল না।'

'বুঝতে পারছি। মাননীয় আদালতও নিশ্চয় বুঝবেন। কিছু হবে না আপনাদের। এই একটা রুটিন শুনানী, তারপর খালাস দিয়ে দেয়া হবে। তবে মোহর সব পাবেন না আপনারা, আইন অনুযায়ী অর্ধেক নিয়ে নেবে স্টেট।'

'নিক। তার পরেও যা থাকবে, অনেক টাকার জিনিস,' হাসল ওমর। 'আর মোহর! প্রাণে যে বেঁচেছি এইই যথেষ্ট। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।'

'ও হ্যাঁ,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'ট্রলারে একজন সিভিলিয়ান ছিল। লাশের পকেটের কাগজপত্র ঘেঁটে তার নাম জানা গেছে, সিডনি...'

'...বারডু,' বলে উঠল ওমর। 'ও-ই পাইলট, আমাদের বিমান চোরদের একজন। ম্যারাবিনা থেকে চুরি করেছিল। হ্যামারের সঙ্গে ওর থাকার কথা, তাই ভাবছিলাম, বারডু গেল কোথায়? বোধহয় ডেকের নিচে থাকতেই আমাদের গুলি লেগে মরেছে।'

'গোলা লেগে,' শুধরে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'শরীরের অর্ধেকটা উড়ে গেছে, যেন শেলের আঘাতে...'

'গোলাও নয়,' হাসল ওমর। 'আদিম সুইভেল-গানের কাণ্ড।'

'হুঁ। আচ্ছা, চলুন এখন দ্বীপে যাই। গ্রালিয়নটা দেখাল আমাদের। দুর্গটাও। এসব প্রাচীন জিনিসের প্রতি আমার ভারি কৌতূহল। যাবেন?'

'সানন্দে। আসলে, আমরাও ভালমত দেখতে চাই জাহাজটা। সেদিন তাড়াহুড়ো ছিল, তাছাড়া অন্ধকার, দেখতে পারিনি সব।'

বাকি দিনটা দ্বীপে কাটাল অভিযাত্রীরা, কখনও একা, কখনও দল বল নিয়ে। রাজকীয়-গ্যালিয়নের ভেতরে বাইরে যতখানি দেখা সম্ভব, দেখল। দ্বীপটা ঘুরে দেখল। সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল নৌ-বাহিনীর একজন গার্ড। যখন অন্ধকার হলো, আর কিছু দেখা গেল না, তখন ফিরে এল ওরা জাহাজে। দুর্গ থেকে লুই ডেকেইনির কালো পতাকাটা খুলে নিয়ে এসেছে বব, বন্ধুদের অনুমতি নিয়ে রেখে দিয়েছে ওটা তার কাছে, ট্রফি।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার পর ছাড়ল ডেস্ট্রয়ার। রাতের বেলায়ই বেতারে কিংসটনে আমেরিকান নৌ-ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ক্যাপ্টেন, তাঁর ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছেন। সোজা ওখানে গিয়ে রিপোর্ট করার আদেশ

পেয়েছেন ক্যাপ্টেন।

ক্রেন দিয়ে টেনে তুলে ডেকে বহাল তবিয়তে ক্যানভাসের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সিকরস্কিটাকে। ডেক চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে কথা বলছে ওমর আর ববের বাবা।

বব, কিশোর আর মুসা দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের ধারে। নোঙ্গর তোলা দেখছে। রাতের বেলায়ই কয়েকটা ডলফিন্ এসে জমা হয়েছে জাহাজের ধারে, ফেলে দেয়া খাবারের টুকরো-টাকরার লোভে। স্বচ্ছ পানিতে খেলা জুড়েছে ওগুলো। কখনও তাড়া করে যাচ্ছে একে অন্যকে, বোতলের মুখের মত নাক দিয়ে গুঁতো মারছে পেটে, কখনও লাফিয়ে শূন্যে উঠে ডাইভ দিয়ে পড়ছে। সূর্যের সোনালি আলোয় অপরূপ সুন্দর লাগছে জীবগুলোকে।

জাহাজ ছাড়ল। ডলফিনের দলও চলল সঙ্গে সঙ্গে। কোথা থেকে এসে হাজির হলো একটা শাদা অ্যালবেট্রস, উড়ে চলল জাহাজকে অনুসরণ করে।

'অভিশপ্তটা মারা গেছে, প্লেনে বাড়ি খেয়ে,' পাখিটাকে দেখতে দেখতে বলল মুসা।

'কে বলল তোমাকে?' ঘুরল কিশোর।

'কেন, মরেনি? তাহলে অ্যাকসিডেন্টটা করল কে?'

'অ্যালবেট্রসই, এটার মতই সাধারণ আরেকটা পাখি। অভিশাপ-টভিশাপ কিচ্ছু না, ঝড়ের তাড়া খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধাক্কা লাগিয়েছিল প্লেনের সঙ্গে।'

'মোহরের অভিশাপ তাহলে বিশ্বাস করো না তুমি?' বলল বব।

'অভিশাপ না কচু। সব মনের ভয়।'

'তাহলে এই যে, এতগুলো অঘটন ঘটল? মোহরটা যে-ই ছুঁলো, মরল?' প্রতিবাদ করল মুসা।

'তুমি মরেছ? আমি, বব, কিংবা ওমরভাই মরেছে? ববের বাবা মরেছেন, আসলে যা ঘটার এমনিতেই ঘটত। হ্যামার আর অন্যরা যারা মরেছে, মোহরের লোভে মরেছে, অভিশাপে নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভালমত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখো কোন দ্বিধা থাকবে না আর।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওমরভাই খামোকাই অভিশপ্ত মোহরটা ফেলেছে? না ফেললেও চলত?' বব আফসোস করল। 'আহ্হা, তাহলে তো ভুল হয়ে গেছে। স্যুভনির রাখতে পারতাম।'

'ওটাই যে সেই মোহরটা, কি করে জানলে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'গর্তে পেয়েছ, আরও তো মোহর ছিল। সবই একরকম। কোনটা তুলতে কোনটা তুলে পাথরে রেখেছ, শিওর হচ্ছ কি করে?'

'তাই তো!'

'যাক ওসব কথা। দেশে ফিরে এত টাকা দিয়ে কি করবে বলো দেখি?'

'আমি আর কি করব? ভাল হোস্টেলে থেকে ভাল ইসকুলে পড়ালেখা করব, ব্যস। তবে বাবা বোধহয় ভাল দেখে একটা জাহাজ কিনবে,' হঠাৎ কিশোরের হাত চেপে ধরল বব। 'কিশোর, আমার একটা কথা রাখবে? তিন গোয়েন্দায় শরিক করে

নাও না আমাকে, চার গোয়েন্দা করে ফেলো। প্লীজ।'

হাসল কিশোর। কৌশলে এড়িয়ে গেল অনুরোধটা, বলল, 'কেন, গোয়েন্দা হতে চাও কেন? ভাল একটা পালের জাহাজ বানিয়ে জলদস্যু হয়ে যাও না? টাকা তো আছেই।'

'আহা, তা যদি হতে পারতাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বব। নীল পানিতে ডলফিনের খেলা দেখতে দেখতে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেল সে, বোধহয় লুই ডেকেইনির কথাই ভাবছে। এক সময় মুখ তুলে বলল, 'জলদস্যু হই আর না হই, নাবিক হবই। জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব খোলা সাগরে। এতদিন মনে মনে দোষ দিয়েছি বাবাকে, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, কিসের নেশায় ঘর ছেড়েছে বাবা। এই খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, নীল সাগর···আহা!' আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে।

— o —